আজকাল নির্বাচন ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। কে কতটা কাজ করার যোগ্য বা কার রাজ্যকে সঠিক ভাবে চালানোর ক্ষমতা আছে, সে সব না যাচাই করেই সুপারিশের জোরে বা গুণ্ডাগর্দির ক্ষমতা দেখেই প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বহুক্ষেত্রে। যাঁরা নিজেদের ঠিক পথে রাখতে পারেন না, সেইসব নেতারা রাজ্যের কি উন্নতি সাধন করবেন! জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তাদেরই ক্ষতিসাধন। প্রতিবারই এই এক খেলা, তবু মানুষ ভোট দিতে যান আশায় আশায়...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৭
জানুয়ারি ২০২১

আ
শা

সং
খ্যা

কলম হাতে

দেবাশিস চক্রবর্তী, ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, নবীন চৌধুরী, সুজন ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার বসু, পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাস, ডঃ মালা মুখার্জী, নন্দিতা চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

দীর্ঘ কারাবাসের ন্যায় আমরা সকলে কাটিয়েছি সম্পূর্ণ একটা বছর। এই একটা বছর হয়তো আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছে। তবে সেই শেখাটা যে আমাদের একেবারে বোধ্যগম্য হয়েছে, সেটা বলা কঠিন। কারণ আমরা এখনো অসাবধানতার ভাঙ্গা সিঁড়ি ধরে তালে তাল মিলিয়ে চলছি। যাই হোক, বিগত বছরে বহু মানুষ যেমন তাদের প্রিয়জনেদের হারিয়েছে, তেমনি বহু স্বনামধন্য বরেণ্য ব্যক্তিদেরও হারিয়েছি আমরা চিরতরে। একসাথে সারা বিশ্বে আর্থিক সংকটও বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর।

তবে যে শুধু ক্ষতি হয়েছে, তা কিন্তু নয়। মানুষের যে একে অপরের সাথে মানসিক আদান-প্রদান ছিল সেটা পুনরায় মূল স্রোতে ফিরে এসেছে দীর্ঘদিন গৃহবন্দী জীবনাবস্থায়। কিছুটা হলেও অবসর সময় কাটানোর জন্য সাহিত্যকেও আপন করতে পেরেছে মানুষ। আসলে সময় ভাল-মন্দ দুটোকেই নিয়ে এগিয়ে চলে, আমরা মন্দ দেখে অনুতাপ, অনুশোচনা করি। কিন্তু কবিগুরুর ভাষায়, **"ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যেরে লহ সহজে।"** এটা যদি মন থেকে মেনে নেওয়া যায়, তবেই রোজ নতুন করে নতুনভাবে একটু একটু করে নতুন আশা নিয়ে বাঁচা যায়। তাই ইংরাজি নববর্ষে সকলে সুস্থ থাকুন, সতেজ থাকুন এবং সঙ্গে থাকুন। আর ঠাকুরের কৃপায় তাঁর বাণীতে **"সবার চৈতন্য হোক।"** ■

বিনীতা –

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ (বড়দিনে) আশার আলো...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

কলম হাতে

কলম হাতে

পাঠকের দরবার

সাগরিকা চক্রবর্তী
সাহিত্যিকা

ডিসেম্বর সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

গুঞ্জনের প্রতিটা লেখাই খুবই মনোগ্রাহী। তবে কয়েকটি লেখা আমার খুব বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, যেমন — সামিমা খাতুন মহাশয়ার কবিতাটা পড়লাম বাস্তব লেখা বেশ ভালো লাগলো। শামসুদ্দিন শিশিরবাবুর লেখাটাও খুব সুন্দর, ছোট্ট ছেলে সৈকতের মনের প্রশ্ন তার দাদী সমাধান করে দিলো এখন সে নিশ্চিন্ত। দীপঙ্করবাবু তাঁর দাদুর সুন্দর করে বলা গল্পগুলো এমন করে লেখেন মনে হয় দাদুর মুখেই শুনছি, তবে দাদু সত্যিই ভীষণ ভালো গল্প বলেন। প্রশান্তবাবুর 'নবদিগন্ত' পড়ে অনেক কিছু নতুন জিনিস জানতে পারলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাকে। সোমনাথবাবুর কবিতাটা নামের মতোই বাস্তব, আমাদের জীবনের কথা, বেশ ভালো লাগলো। আরও নতুন নতুন লেখা পড়তে চাই। ■

শুভ নববর্ষ

আবদুল বাতেন (আমেরিকা)

শুভ নববর্ষ, বাবু আমার!
দ্যাখ-যাচ্ছে সরে গ্রহনকাল আমাদের স্পর্শের
অরুণিমায়।
মেঘ ময়ূরের প্রসারিত পেখম দূর দিগন্তের দুয়ারে
সুশোভিত! আমাদের চুম্বক চোখাচোখিতে-
উড়ছে রঙিন বেলুন ঘুড়ি ফানুস, সুন্দরী শহরের ছাদে ছাদে
ডালিম মৌ হয়ে নাচছে নিরন্তর আনন্দাশ্রুগুলো,
আমাদের। বিশ্বাস কর কেশবতী,
আমাদের ঝাল ঝাল মিষ্টি চুম্বন হুবহু চেরাগ, আলাদ্দীনের!
নাহলে, পলাতক পাখিরা ফিরছে কেন,
এক দুই তিন করে...? নীড়ে নীড়ে
নবান্নোৎসব! এসো-আমাদের যৌথ খামার ভরে
উঠুক সুন্দরের ছানাপোনায়!
মানবতার মিছিলে ঢেকে যাক ঘর
বারান্দা রাজপথ অলিগলি। ■

বিকল্প মিডিয়া

দেবাশিস চক্রবর্তী

"যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শবের ভেতর/ যেখানে অনেক মশা বানিয়েছে তাহাদের ঘর।"

এরকম কবিতার লাইন মনে হয় সকলেই লেখেন না। কেউ কেউই লেখেন। জীবনানন্দ দাশের মত কবিরা লেখেন, আর এই কবিতার লাইন ধরে কয়েক পা হাঁটতে পারলেই মনে হয় আমরা দেখি, আজ আধুনিক 'কর্পোরেট' গণ 'মিডিয়া'র সৌজন্যে সংবাদের লাশের ভেতর শুধুই মনে হয় অর্থের রূপালী আলোরা আসছে। চারিদিকে বিষাক্ত চিন্তার মশা মাছিরাই, খুব যত্ন সহকারে বানিয়ে তুলছে নিজেদের ঘরবাড়ি 'হাই-ফাই' মিথ্যার অট্টালিকাগুলোকে।

ফলে গদি 'মিডিয়া' বা 'পেড নিউজ'এর এই মহামারীর যুগে, সংবাদ যখন মূলতই পণ্য হয়ে উঠেছে, সে সময়ই বৃহস্পতি যেভাবে আজ শনি গ্রহের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, প্রায় সেভাবেই হয়তো আজ — সংবাদ ও কৃষকের লাঙ্গল, ট্রাকটারের টায়ারের দাগ, মেহনতী মানুষের কান্না ঘাম ও স্বপ্নের গল্পগুলোও পাশাপাশি এসে

জোট বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর মানুষের এই জোটের অন্য নাম হয়েছে আজ সংবাদপত্র, ‘ট্রলি টাইমস’এর মত সংবাদপত্র। দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে উঠে এসেছে এই সংবাদপত্র।

যে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ রাখলেই, সবার আগে আপনার চোখে পড়বে ভগৎ সিংকে। তরুণ সেই বিপ্লবীর স্বদেশ ও বিশ্বকে নিয়ে দেখা, একটা স্বপ্নের যাত্রাকে একভাবে নিজেদের মুখবন্ধ হিসেবে তুলে ধরছে এই সংবাদপত্র। ফলে বিশিষ্ট সাংবাদিক রাবিশ কুমার হয়তো খুব সঠিকভাবেই বলেছেন যে, গদি ‘মিডিয়া’ বা ‘কর্পোরেট জার্নালিস্ট’দের হাতেই ‘জার্নালিজম’ আছে। কিন্তু কৃষকদের হাতে আছে নিজেদের সংবাদপত্র। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল — হঠাৎ কৃষকরা নিজেরাই কেন বার করতে এগিয়ে এলেন এই সংবাদপত্র? আর ‘মিডিয়া’র প্রিয় শব্দ ‘জার্নালিজম’এর সঙ্গে, এই সংবাদপত্রের পত্রকারীতার তফাৎটাও বা ঠিক কোন জায়গায়?

আর এই প্রশ্নগুলোর উত্তররাও মনে হয় খুব একটা জটিল নয়। প্রথমত, যেভাবে দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে কখনো খালিস্তান পন্থীদের চিত্রনাট্য, কখনো বা উগ্র বামপন্থীদের ‘হ্যান্ড ওয়ার্ক’ বলে হইহই করে প্রচার শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলা গদি মিডিয়া – সেই একতরফা স্বৈরাচারী প্রচারের বিরুদ্ধেই,

'আমাদের কথা' – অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও স্বপ্ন দেখতে পারা মানুষের ভাষাগুলোকেই সজোরে তুলে ধরার প্রচেষ্টা থেকেই আজ আত্মপ্রকাশ করেছে এই বিকল্প 'মিডিয়া'। অর্থাৎ 'ট্রলি টাইমস'এর মত মিডিয়া। অনেকদিন আগে হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস বলেছিলেন — একটা মিথ্যাকে বারবার নানা কায়দায় উচ্চারণ করলে সেটি সত্য হয়ে যায়।

আর ইউরোপের 'ক্যাপিটালিজম'এর ভেতর থেকে, যে 'জার্নালিজম' উঠে এসেছিল – যাকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে অভিহিত করা হয়েছিল — সেই 'জার্নালিজম'এর শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ক ও মননের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল হয়তো যে কোনও মূল্যে বিজ্ঞাপন আদায় বা 'সুপার প্রফিট'এরই ধারণা। ফলে ব্যবসার প্রয়োজনে মিথ্যেই হয়তো বা আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে সত্যের অন্য নাম। ফলেই আধুনিক এই 'জার্নালিজম', মুখে স্বীকার না করলেও তার মনন জুড়ে জড়িয়ে গিয়েছিল গোয়েবলসের সেই তত্ত্বজাল। একটা উদগ্র মিথ্যেকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার তত্ত্বজাল।

আর এই জালের বিপরীতে মানুষের গল্পরাও যে সংবাদ। মানুষের খিদে, প্রেম ও মনের আগুনও যে আসলে সংবাদ, সেই বিকল্প 'নিউজ'এর ভাষ্যকেই তুলে ধরছে আজকের এই 'ট্রলি টাইমস'। ফলে হিন্দি ও

পাঞ্জাবি ভাষায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কৃষকরা নিজেরাই লেখার চেষ্টা করছেন নিজেদের কথা, টুকরো টুকরো জীবন ও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা ও কাহিনীগুলোকে, তাই হয়তো এই সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই দুই কৃষকের কথা, যাঁরা এতোদিন শুধু মারামারি করে এসেছেন। পাশাপাশি দুই বাড়ির কৃষক এতদিন পর্যন্ত একে অপরের মাথাই ফাটিয়েছেন, একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

কিন্তু এই কৃষক আন্দোলনে এসে, তাঁরা এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন যে, "এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।" অর্থাৎ ঐ লড়াই ও মামলাগুলোর কোনও দরকারই ছিল না। ফলে সংবাদপত্র বলতেই শুধু খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির ধারা বিবরণী বা মসলাদার 'স্টোরি' নয়। সংবাদ মানে আসলে যে জীবনকে খোঁজা, জানা ও বোঝা, এই অনুপম অনুভবের গল্পমালাকেই হয়তো তুলে ধরেছে আজকের সময়। 'ট্রলি টাইমস'এর সময়। ■

পুতুপুতু

সহপাঠী

এক যে ছিল নন্দলাল,
দেয়ালিতে মাখত গুলাল।
চলাফেরা মৃদু বেগে,
কথায় কথায় যেত রেগে...

চমক ঢমক কাপড় জামায়,
গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।
মাথার চুলে পাখির বাসা
ছবি আঁকার বড্ড নেশা...

স্কুলে আসত গাড়ি চড়ে,
দুই ডাব্বা টিফিন ভরে।
একএকটা ক্লাস শেষ হলে
নন্দলালের মুখ চলে...

নন্দলালের জানাই ছিল
হবে নাকি আর্টিস্ট ভাল।
অনেক কষ্টে ‘এইট’এ উঠে
স্কুলের থেকেই গেল ফুটে...

লেখাঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.) চিত্রাঙ্কনঃ অনিশা দাস

বই

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'-এর দোকান থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলেজ স্ট্রীটে এবং কলকাতার বিভিন্ন বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

তৃতীয় পর্যায় (৩)

খুব ভরেই চলা শুরু করেছি। আজ শুক্রবার। পাড় ধরে চলেছি, কিন্তু এখানেও সেই পারথেনিয়াম, হাঁটা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কতটা হেঁটেছি জানি না, আটটার সময় ফাঁকা হল জঙ্গল। খুব বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে আরও এক ঘণ্টা যাওয়ার পর গ্রামের পথ ধরলাম। এলাম গরারু গ্রামে। একটি বাড়িতে পরিক্রামাবাসীদের সেবার জন্য লেখা আছে দেখে দিব্যানন্দজী দাঁড়িয়ে পড়লেন, ছাতু চা খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। নদীর পাড় ছেড়ে মূল সড়ক ধরে হাঁটা শুরু করলাম। গরুর এইখানে তাপস্যা করেছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম গরারু।

সাড়ে ন'টার মধ্যেই রোদের তাপ খুব বেশি। রাস্তার দু'পাশে গম চাষ হচ্ছে। অশোকবাবু বাড়িতে গিয়ে কি কি বলবেন, তাই দিব্যানন্দজীকে বলছেন, আর দিব্যানন্দজী কি বুঝতে পারছেন জানি না, কিন্তু মাথা নেড়ে চলেছেন। আমরা এগিয়ে চলেছি, রাস্তার যেন শেষ নেই। কত ধরনের মানুষ, তাদের চিন্তা, তাদের চাওয়া-পাওয়া সব আলাদা।

তাই তাদের লক্ষও আলাদা। কিন্তু আমাদের লক্ষ স্থির, ভালভাবে পরিক্রমা শেষ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে এখন আমরা এগিয়ে চলেছি ভ্রামরীর দিকে। শুধু ফসল আর ফসল, তার মাঝে ছোটছোট ঘর, জমিতে জল দেওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। ঐ রকমই একটি ঘর থেকে একজন লোক আমাদের অনুরোধ করলেন তাঁর ঘরে চা খাওয়ার জন্য। তখন দুপুর বারোটা, অনেকক্ষন হাঁটা হয়ে গেছে, তাই একটু বিশ্রাম দরকার ছিল। শুধু চা নয়, ওনার স্ত্রী আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যেও অনুরোধ করলেন, এবং দিব্যানন্দজী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে রাজি হয়ে ঐ মহিলাকে ধন্য করলেন। ঐ গ্রামেরই একজন রাত্রে ওনার বাড়িতে থাকার কথা বললেন, সবিনয়ে ওনাকে না বললাম।

দুপুর তিনটের সময় সূর্যের তেজকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছি। এবারে আমাদের হাঁটা আশানুরূপ হয়নি, লু-র জন্য। দু'ধারে আমগাছের থেকে আম পড়ে আছে, কিন্তু কুড়ানোর কেউ নেই। আমি কয়েকটা আম কুড়িয়ে ঝোলায় রাখলাম, কারণ অনেকেই প্রসাদ চায় তাই। আপন মনে জপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে 'নর্মদে হর' বলে সামনে এসে দাঁড়াল, পিছনে তার দিদি। আমিও 'নর্মদে হর' বলে ওদের আমগুলো দিলাম। খুব খুশি হয়ে মেয়ে দুটো বাড়িতে ছুটে গেল। 'বাবুজি বাবুজি দাঁড়ান,' ডাক শুনে পিছন ফিরে দেখি মেয়ে দুটি ছুটে আসছে আমাদের দিকে চা খাওয়ার বার্তা নিয়ে।

কাকাজীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমি ঐ নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়ে দু'টকে বিমুখ করতে পারলাম না। প্রায় সাড়ে চারটের সময় ওদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আবার এগিয়ে চললাম। এগিয়ে চলেছি, রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ বনস্পতির বুক চিরে পিচ বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, দূরে মাঠে চাষ হচ্ছে। আর আমরা চারজন পরিক্রমাবাসী এগিয়ে চলেছি অনন্তের দিকে।

"ভজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে।" এই কথাটি এখন আমাদের জীবনের সাথে ভীষণভাবে মিলে যাচ্ছে। একটি গ্রাম পড়লো, নামটা মনে পড়ছে না, ঐখানে কোথাও আজ রাতের মত থাকার ইচ্ছা ছিল দিব্যানন্দজীর, কিন্তু কাকাজী চাইছিলেন আরোও একটু এগিয়ে যাই। তখনো সন্ধ্যে হয়নি, তাই আরো কিছুটা পথ এগিয়ে চললাম। এখানে দেখলাম পাহাড় ফাটিয়ে নূতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। জঙ্গল বেশ গভীর। কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ করে যেন সন্ধ্যে খুব তাড়াতাড়ি নেমে এল। চারদিক দিয়ে পাহাড় আমাদের ঘিরে ধরেছে, সঙ্গে জঙ্গল, যেন দম বন্ধ করা অবস্থা। এই অবস্থায় যা হয়, আমাদেরও তাই হল। দিব্যানন্দজী পথ হারিয়ে ফেললেন।

পরিক্রমাবাসী মা নর্মদাকে চোখে চোখে না রাখলে কি হবে, মা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন, কথা যে কতখানি সত্যি, সেটা আজকের পর আরও দৃঢ়ভাবে অনুভূত হল।

নমামি দেবী নর্মদে

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। দিব্যানন্দজী তাঁর কাছে পথ জানতে চাইলেন, মহিলা জঙ্গলের দিকেই দিক নির্দেশ করলেন। কাকাজী কিছুতেই মহিলার দেখানো পথে যেতে চাইছেন না। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তাই উনি একা না দাঁড়িয়ে আমাদের সাথেই এলেন। যত সামনে এগিয়ে চলেছি, জঙ্গল ততই ফাঁকা হয়ে আসছে। আমরা একটা তিন মাথায় এসে পড়লাম। একজন লোক মাথায় একটা বস্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, ডেকে তার কাছে রাত্রে থাকার জায়গা কোথায় পাব জানতে চাওয়ায়, সে তার বাড়িতে যাবার জন্য বলল, আমরা নিরুপায় হয়ে রাজি হলাম। প্রায় আধ কিলোমিটার চড়াই উঠে একটি বাড়ি দেখলাম – বড় বাড়ি, সবাই আমাদের সানন্দে গ্রহণ করল। লোকটির পোশাক দেখে ভেবেছিলাম গরীব, এবং আমাদের জন্য ওদের হয়তো সমস্যা হবে। কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ১৪-১৫ বছরের দুটি মেয়ে আমাদের সাথে সারাক্ষণ ছিল। চা, রাত্রের খাবার থেকে শুরু করে রাত্রে ছাদে আরাম করে শোবার ব্যবস্থা সব করল ঐ বাচ্চা মেয়ে দুটি। সন্ধ্যে বেলায় ঐ বুড়ি মা যে কোথা থেকে এলেন আর কোথায়ই বা গেলেন! তার হিসাব কিন্তু পরে আর পাইনি।

নর্মদে হর। ...ক্রমশ ■

যেতে নাহি দিব

বিশ্ব প্রসূন চ্যাটার্জি

লকডাউন শেষ, এবার আমার কর্মস্থল পুনেতে ফিরব। কলেজে ডেকে পাঠিয়েছে। এতোদিন মুম্বাইতে ছিলাম। আটমাস বাড়িতেই। আমার ছেলের জন্মের পর এতো দীর্ঘ সময় ওর সাথে কাটাইনি আগে। ওর জন্মের এক বছরের মধ্যেই আমি পুনেতে চাকরি পাই। তাই সপ্তাহের শেষে, আর ছুটিতে আসতাম। কিন্তু ছেলের সঙ্গে একটানা এতো সময় কখনই কাটাইনি। লকডাউনের আটমাস ওর সাথে খেলেছি, পড়িয়েছি। এবার লকডাউন শেষ, ফিরে যেতে হবে আমায়...

হঠাৎ ছেলে বলল, “বাবা, তুমি চলে যাবে? আর আসবে না?” ছেলে কাঁদছে, আমি কাঁদছি আর বউও কাঁদছে। কানে বাজতে লাগলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা — “যেতে নাহি দিব।”

অনেকেই প্রশ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ কি প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে? কিন্তু ২০২০তেও রবীন্দ্রনাথ সমানভবে প্রাসঙ্গিক। তাই আজও যখন বাবা ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরে তার পরিবারকে ছেড়ে, তখন কানে বাজে — “যেতে নাহি দিব।” ■

শ্রদ্ধাঞ্জলি
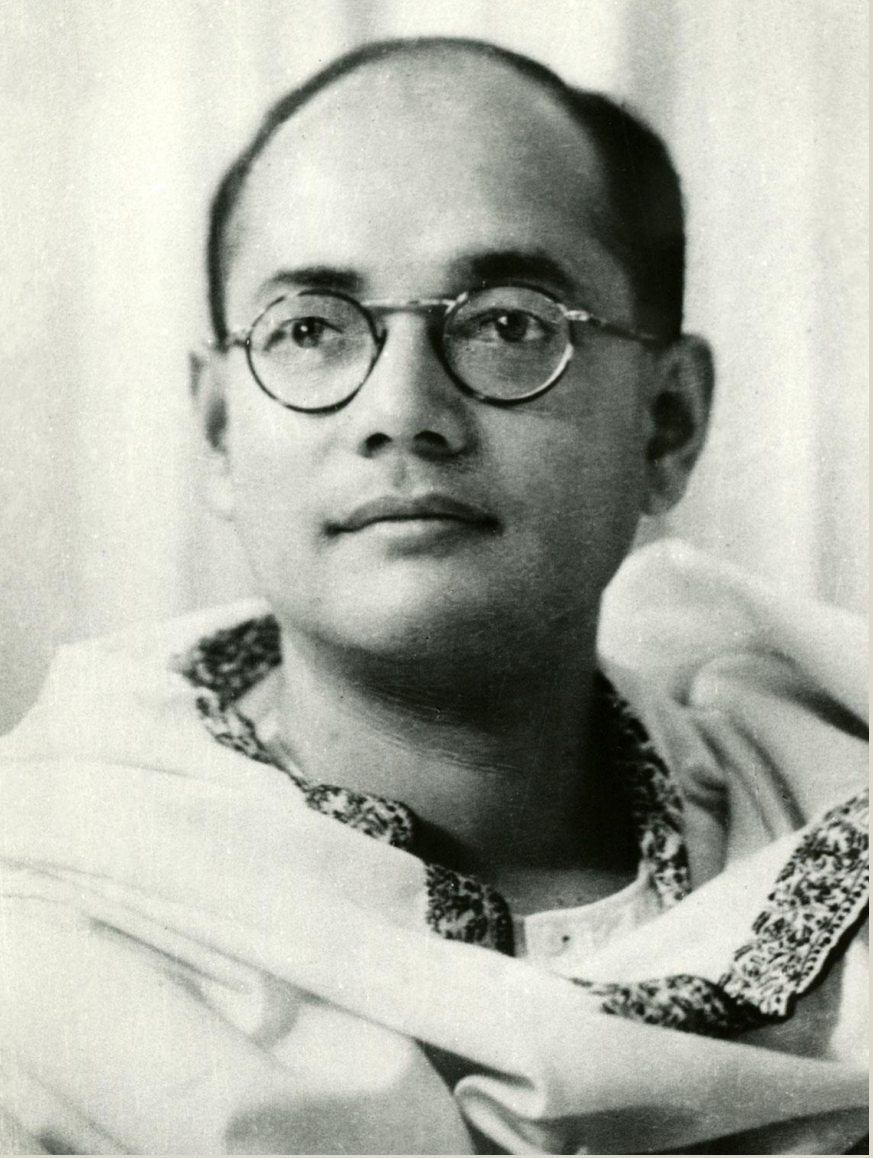
দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিবসে

আমরা জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম...

'পাণ্ডুলিপি'র পরিচালক সমিতি

Image Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhas_Chandra_Bose_NRB.jpg

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(৬ষ্ঠ পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

রাজশাহীতে ফিরে এসে ট্রেনের টিকিট কাটার উদ্দেশ্যে স্টেশনে রওনা দিলাম। আগামীকাল সকালবেলা আমার গ্রামে যাব। দাদুর স্বপ্নের গ্রাম। তখনো আমি বাড়িতে জানাইনি যে আমি আগামীকাল গ্রামে যাব দাদুসহ। বাড়িতে একটা ফোন করলাম। ওপাশ থেকে মায়ের গলা।

— কেমন আছিস বাবা?

— ভালো আছি। তুমি?

— আমিও ভালো আছি।

— আমি আগামীকাল বাড়ি আসব এক দাদুসহ।

— বলিস কি! কোন দাদু?

— কলকাতার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁকে আমি দাদু বলে ডাকি। তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। এখন আমার কাছেই আছেন। আগামীকাল আমরা এক সঙ্গে বাড়িতে আসব।

— ফেসবুকে আবার এভাবেও পরিচয় হয়! তাহলে তো সমস্যাই হলো। আমি আর তোর বাবা, তোর দিদির বাড়িতে

এসছি আজকেই। তবে, বাড়িতে তোর মাসি আছে।

— তোমরা কবে ফিরবে?

— আরও দু'তিন দিন পরে বাড়িতে ফেরার কথা। তবে, তোরা যেহেতু আসবি সেহেতু কালকেই বাড়ি ফিরবো। তবে ফিরতে ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা লাগবে।

— লাগুক; তবু কালকেই এসো। দাদু একদিনই থাকবেন।

— আচ্ছা। রাখছি এখন।

— আচ্ছা রাখ।

টিকিট কাটার শেষে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে এসে দেখি দাদু আরাম করে শুয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করছেনঃ

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে, এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে..."

— আরে দীপুদা কবিতার ঘোরে ভুলেই গেছিলাম তুমি এসছো।

— টিকিট পেয়েছো?

— হ্যাঁ। সকাল ৬:২০ তে ট্রেন, তিতুমীর এক্সপ্রেস।

— ওহ্, জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন শুনে মনে পড়লো নবান্নের কথা।

— তোমাদের গ্রামে নবান্ন পালন করা হয়?

— হ্যাঁ। খুব ধুমধাম করে। কীভাবে পালন করা হয় শোনো তাহলে...

উৎস

হেমন্তের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত হয় সোনালী মাঠ। সবুজের সমারোহ সুদূরে মিলিয়ে সবুজ রূপ নেয় সোনারঙে। সূর্যের আলোর ঝলকানিতে সোনালী ধানের শীষের জ্যোতি কৃষক মনে আনন্দের লহর বইয়ে দেয়; ঘামের দামে কেনা ধানের শীষ দেখলে কৃষক-মুখে ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক। মন আনন্দে গেয়ে ওঠে — **"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা..."**

বেশি না; মাত্র ৩৬-৩৭ ঘরের বসতির ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের সকলেই সনাতন ধর্মাবলম্বী ও সকলের নামের শেষে 'সরকার' পদবী যুক্ত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এখানকার সংস্কৃতিও এক ও অভিন্ন। একজনের বাড়িতে বিয়ে হলে যেমন পাড়াসুদ্ধ লোকের ভিড় জমে তেমনি দুর্গাপূজায় সবাই মিলে একসঙ্গে আরতি করতেও এদের কৃপণতা নেই। পূজা পার্বণে গ্রামবাসী মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ঠিক এরকম একটি গ্রামে আমার বেড়ে ওঠা।

গ্রামীণ সকল উপাদান দিয়ে বিধাতা যেন নিজ হাতে সাজিয়েছেন ছোট্ট এই গ্রামটিকে। আবহমান বাংলার রূপ-রস-গন্ধ তিনের সংমিশ্রণে এই গ্রাম হয়ে ওঠে রূপের আধার; সহজ-সরল মানুষ; সহজ হবার ব্রত নিয়ে বেড়ে ওঠে প্রতি নিয়ত।

উৎস

আবহমান বাংলার সঠিক সৌন্দর্যটি এমন একটি গ্রামে না জন্মালে কষ্মিনকালেও উপলব্ধি করতে পারতাম না। মেঠো সরুপথ রাস্তাটি গ্রামের মাঝখান দিয়ে স্রোতস্বিনী নদীটির মতো দিগ্বিদিক এঁকেবেঁকে চলেছে; রাস্তার দুদিকে গাছের সারি – যেন গ্রামটিকে পাহারা দিচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে ছোটনদী ঠিক যেন রবি ঠাকুরের ছোটনদীর মতো।

সূর্যের কিরণ নদীর জলের সঙ্গে মিললে যদি হালকা ঢেউ দেয়; তা যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে সেটির ভাষা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো কঠিন। শিল্পীর তুলি নাকি তুলি-শিল্পী দুইকেই একসূত্রে বেঁধে রাখে ছায়া ও মায়ায় ঘেরা আমাদের গ্রাম।

আমাদের গ্রামটি একটি কৃষি নির্ভর গ্রাম। সকলেই মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামীণ জীবনে উৎসবগুলো যেন গ্রামবাসীর কাছে মিলনমেলা স্বরূপ। কৃষিভিত্তিক গ্রামে নবান্ন উৎসব উদযাপন ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। পহেলা অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঘরে ধান তোলার পর্ব।

নবান্ন বরাবরই আমার কাছে একটি পছন্দের উৎসব। নবান্নের দিনে বাবা ও আমি সকালবেলা স্নান সেরে নিই। তারপর দুজনের পরনে থাকে ধুতি। এদিকে দিদি পুরো বাড়ি আলপনা দিয়ে সাজিয়ে রাখে; রঙবেরঙের নকশা; আলপনার সাদা রঙে রাঙিয়ে তোলে পুরো বাড়ি। ঘরের

বারান্দা থেকে বাড়ির উঠোন কিছুই বাদ যায় না।

তারপর, সঙ্গে কাস্তে, কুলা, নতুন গামছা, দিয়ার-সলতে, ধুপ নিয়ে আমি, বাবা ও দিদি ধানের জমিতে যাই। জমির এককোণায় বসে পূজা করি। বাবা মন্ত্রোচ্চারণ করেন, আমি আর দিদি বাবার সঙ্গে সেই মন্ত্র আওড়াই। এরপর ধানের গোছা ডানহাত দিয়ে ধরে বাম হাতে কাটতে হয়। কয়েক গোছা ধান কেটে কুলায় ভরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেই। আমার সঙ্গে দিদি শাঁখ বাজাতে থাকে। ভাইবোন পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলতে থাকি সেই অপু দুর্গার মতো। বাড়ি ফেরার পথে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গ্রামের অনেকের সঙ্গে দেখা হলে অনেকে কথা বলানোর কিংবা হাসানোর চেষ্টা করে; আমরা তবুও কথা বলি না। এদিকে মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বাড়ির উঠানে আসামাত্র মা একটা পিঁড়ি পেতে দেন। শাঁখ ও উলুধ্বনির শব্দে মুখরিত হয় বাড়ির উঠোন। তারপর একজগ জল দিয়ে মা পা ধুইয়ে দেন। এভাবে ঘরে নতুন ধান তোলা হতো।

এরপর, বাবা অনেকগুলো ধান মাঠ থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেই ধান মা, মাসিরা রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে ভানেন। ধানের আঠা সহযোগে দুধ, কলা, গুড়, আখ মিশিয়ে একধরনের খাবার তৈরী করা হয়। এই খাবারটি প্রথমে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। তারপর আমরা সবাই গোল হয়ে বসে সেটি খেয়ে নিই। যার জন্মবারে নবান্ন

পড়বে সে নিজে হাতে খেতে পারবে না। যদি কখনো আমার জন্মবারে নবান্ন হতো, তবে মা কিংবা বাবা খাইয়ে দিত। এভাবেই দিনটির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতো।

পরের দিনে রাস্তার মোড়ে খাসি কাটা হয়। সেই খাসি কাটা দেখে শিশুদের সেকি আনন্দ, তবে যার বাড়ির খাসি কাটা হতো সেই বাড়ির ছোটবাচ্চারা কাঁদতো। দুপুর বেলা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর্ব। এখনো গ্রামে উৎসবটি তার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরেছে। আজও আমাদের গ্রামে আড়ম্বরের সাথে উৎসবটি পালিত হয়।

আমাদের কৃষক মনে দিনটি আরেকবার ভাবতে শেখায়, আরেকবার উপলব্ধি করতে শেখায় — টাকার ঘনঘটা না থাকলেও দিনগুলোকে কতটা সুন্দর; কতটা উৎসবমুখরভাবে পালন করা যায়। কালের খেয়ায় গ্রামীণ সংস্কৃতি বিলুপ্তির স্রোতে উৎসবটি যেন হারিয়ে না যায় সেইদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কারণ, নবান্ন শুধুমাত্র একটি উৎসব না; এটি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির অংশ; এটি আমাদের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যার সঙ্গে মিলেমিশে আছে সোনালী শৈশব; মিশে আছে গ্রামবাসীর পারিবারিক বন্ধন। কবির কবিতায়; কথাসাহিত্যিকের কথার জাদুতে নবান্নের প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে; গ্রামীণ এই উৎসব বাংলা সাহিত্যকে যেমন ঋদ্ধ করেছে তেমনি কৃষক মনেও এক আনন্দের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

উৎস

বাংলার এই রূপ; এই সৌন্দর্য, পালাপার্বণের বৈচিত্র্য; ভাইয়ের-মায়ের স্নেহ; যাপিত জীবনে কোমল হৃদয়ের সাতরঙ; মা, মাটি, মানুষ, প্রকৃতি এখানে এক হয়ে মেশে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।

...ক্রমশ ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯তম জন্মদিবসে

আমরা জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম...

‘পাণ্ডুলিপি’র পরিচালক সমিতি

Image Source:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Swami_Vivekananda_Jaipur.jpg

বুড়ো বয়সে হাতে খড়ি

নবীন চৌধুরী

(২)

দু’জনে মিলে হেড স্যারের সন্ধানে পা চালিয়ে হাঁটছি। তখন আমার মন আমাকে চিনিয়ে দিয়ে বলছে, ‘গুরু’ তুমি না নিজে এ স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলে, কুচবিহার পলিটেকনিকে জি.এস. ছিলে। যে বারে কুচবিহার পলিটেকনিকের সিলভার জুবিলি উৎসব হয়েছিল, সেটা তোমার সেকেন্ড ইয়ার, তখন তুমি জিও-সি-ইন-সি’র পোস্ট হোল্ড করেছিলে, সেবারে কলকাতার নামকরা কোনও গানের আর্টিস্ট বাদ নেই যে আসেনি। টিকিট কেটে প্রায় চার-পাঁচ হাজার দর্শকের সামনে ইয়া বড় একখানা পডিয়ামে মন জুড়ানো রসিকতা মিলিয়ে বক্তৃতা করেছিলে। সেই কি হাততালি। মনে পড়ে, তোমার অংশটুকুতে একটি এক্সট্রা রেকর্ডিং করা হয়েছিল। কলেজের প্রফেসর ও ছাত্রদের কথা ছেড়ে দাও, কলেজের কাছাকাছি পাড়ার মেয়েদের কথা একবার ভাবো, ওদের চাউনিটা অনেকদিন ধরে তোমায় কেমন বিঁধে রাখত। সেই ইতি দত্তের কথা মনে আছে, শেষটায় না পেরে, যে মেয়েটি তোমায় কিনা একখানা লাভ লেটার পাঠিয়ে ছিল।

সেই প্রেমপত্র নিয়ে তোমার জীবনে কম কিছু ঘটনা ঘটেনি।

টুকরো স্মৃতি

আজ লেখাটি পড়বার পরে আমার গিন্নি আমায় আবার বলছেন, ‘বাঃ-বাঃ, ঘটনাটির বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল – তবুও মেয়েটার প্রতি তোমার প্রেম যেন এখনও সেই চাঁদের কলির সাথে ওদের সুরে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি অবশ্য হেসে ও’র সব কথা উড়িয়ে দিয়েছি। আর আজ, এই স্কুলে তুমি প্রাক্তনী অথচ তোমার অবস্থান, মঞ্চের সামনে থাকা ঠান্ডা চেয়ার। এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। মন বলছে, তুমি ছাড়বে না ওই হেড স্যারকে, ও’র সাথে স্কুল লাইফ থেকে তোমার একটা আলাদা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে, জোর দিয়ে ধর ও’কে, মঞ্চে উঠে কিছু ডায়লগ দেওয়া চাই, দম নিয়ে প্রস্তুত হও, একদম ছাড়বে না ওই হেড মাস্টারকে।

দেখতে দেখতে সেই টিচার্স কমন রুমের সামনে সমীরদাকে পেয়ে গেছি। দেখতে পেয়েই সমীরদাকে বললাম, “সমীরদা, আমি কি মঞ্চে উঠে কিছু একটা পারফর্ম করতে পারব না।” আমার শব্দ ভঙ্গিতেই সমীরদা আমার পালস্ ধরে ফেলেছেন। হাজার হাজার টাকার তাসের তিন পাত্তি’র জুয়ো খেলতে গিয়ে এরকম ঘটনা আরও একবার আমার জীবনে ঘটে ছিল, সেকথা পরে একদিন বলা যাবে।

যাকগে, সঙ্গে সঙ্গে সমীরদা আমায় বলছেন, “কে বলেছে তুমি পারফর্ম করতে পারবে না, অবশ্যই পারবে। তুমি কি সঙ্গে করে কোনও লেখা নিয়ে এসেছ?” আমি মাথা নেড়ে ‘না’ বললাম।

তখন সমীরদা সস্নেহে আমায় বললেন, "রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বইটি লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে দিচ্ছি, যা দেখে তুমি একটি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।"

আমি আমার অপারগতার কথা ভাল করেই জানি তাই সমীরদাকে বললাম "আমি নিজস্ব একটা কিছু দিতে চাই।"

এবারে সমীরদা আমায় বললেন "কোন চিন্তা নেই, অনুষ্ঠানের আজ প্রথম দিন মাত্র, আরও ছ'দিন বাকি আছে এর মধ্যে তোমার নিজস্ব কবিতা, গল্প, ফিচার এমনকি একাঙ্ক নাটক যা খুশি তুমি নিয়ে এসো, এ মঞ্চ তোমার মতো প্রাক্তনীদের জন্য অবারিত থাকছে।" এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি নিজস্ব একটা কিছু চাই, তাই মনটাকে শান্ত করলুম এবং বিদায় নিতে গিয়ে সমীরদাকে বলে এলাম, "আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার একটি লেখা নিয়ে আপনার কাছে অবশ্যই আসছি। কিছুটা সময় আমার জন্য চাই।" সমীরদা বললেন – "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।"

রাত সাড়ে আটটা বাজে। অনুষ্ঠান স্থল ছেড়ে রিকশায় চেপে একখানা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছি, কবিতা না পারলেও একখানি ছোটখাটো গল্প অবশ্যই আমি নামিয়ে দেব, তবে লিখবার জন্যে ভালো খাতা কলম চাই। ঠিক সময়ে রাস্তার বাঁ'ধারে ঝকঝকে 'আলোছায়া' দোকানটির দিকে নজর গেল। রিকশা থামিয়ে, হাতের সিগারেটটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দোকানের প্রতি পা বাড়ালাম। দোকানের মালিক অজিতদা,

টুকরো স্মৃতি

সিনিয়র সিটিজেন, পুরনো চেনাশোনা। আমার বাড়ির সবাইকে চেনেন। উনিও আমাদের মতো ময়মনসিংহের মানুষ। কাছে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন 'কিতা চাও?'

আমি বললাম 'একটা খাতা লাগব' উনি শোকেস থেকে একখানা খাতা বের করে আমার সামনে রাখলেন এবং বললেন 'আট টাকা।' আমি দাম মিটিয়ে দেবার জন্য যেই না পকেটে হাত ঢুকিয়েছি তখন উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'খাতা দিয়া কি-তা করবা।' আমি বললাম, 'গল্প লেখবাম।' আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে-ডা লেখব?'

এবারে আমি বললাম, 'আমি লেখবাম।' উনি কিছুক্ষণ আমার মুখের অবয়বটি জরিপ করে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওই খাতাটিকে আবার শোকেসে ঢুকিয়ে দিলেন। তখনকার মতো আমি একটু থতমত খেয়ে ছিলাম আর কি! তারপর দেখি উনি শোকেসের অন্য তাক থেকে আরও একখানা চার নম্বর সিরিজের লম্বা খাতা বের করে আনলেন এবং আমায় দিয়ে বললেন "রুল টানাডা দিলাম, অনেক দিন তো লেখাপড়া কর না, এতে লাইনটা মুটামুটি সুজা থাকব।" তারপর আবার বললেন, "কলমও তো লাগব।" একখানা ভালো কলমও বের করে দিয়ে বললেন "মুট পঁচিশ টাকা।" খাতা কলম নিয়ে, দাম মিটিয়ে যেই না রিকশায় উঠতে যাব অমনি উনি আবার পিছন থেকে ডেকে বলছেন, "ছেলেডা জানি কুন ক্লাসে পড়ে?" আমি বললাম "ক্লাস নাইনে" ফের

বললেন, "ঠিক আছে যাও।"

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় খুলতে খুলতে ভীষণ ব্যস্ততা দেখিয়ে গিন্নিকে বললাম, কাল আমার কঠিন পরীক্ষা আছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও, আজ রাতে আমি গেস্ট রুমে কাজ করব, তোমার সাথে ছেলে থাকবে। তখনকার মতো স্বপ্না ম্যাডাম আমায় কিছু বলেননি তবে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন – "হ্যাঁ গো, এটা কি খুবই বড় টেন্ডার।" আমি বললুম না না, তারপর স্কুলের ঘটনাটা গুছিয়ে বললাম। তখন গিন্নি বলছেন, বুড়ো বয়সে কালিদাস হওয়ার ইচ্ছে। সারা জীবনে ইংরেজিতে পি. ডব্লু.'র গদ-বাঁধা কয়েকটি টাইম এক্সটেনশনের চিঠি ছাড়া যে জীবনে কিছুই লেখেনি, তিনি কি না চলেছেন গল্প কবিতার জগতে সাহিত্যিক হতে। দেখো, ভবিষ্যতে একুল ওকুল দু'কুলই না হাত থেকে চলে যায়। যত সব, যা ভালো বোঝ তাই করো।

খাতা কলম নিয়ে পাশেই গেস্ট রুমে চলে এসেছি। মনে মনে ভাবলাম, কবিতায় হ্যাঁপা অনেক বেশি ওইসব ছন্দ মন্দ আরও অনেক কিছু থাকে। তারপর আমি মুখস্থ করার ব্যাপারে বেশ লব'ডঙ্কা, তার চেয়ে অনেক সোজা গল্প লেখা, সত্যি কথা অনেক সোজা। রাত প্রায় দশটা বাজে। ভগবানের নাম করে লেখা শুরু করেছি। প্রথম পাতা লিখবার পরে, বারান্দায় বেরিয়ে দু-চারটে সুখ টান দেবার পর আবার খাতা কলম নিয়ে বসেছি। যে প্রথম পাতাটি এইমাত্র লিখেছিলাম সেটা একবার

টুকরো স্মৃতি

রিভিউ করতে গিয়ে দেখি সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। এ মা, বাংলা হাতের লেখার যা ছিরি, ভাগ্যিস অজিতদা আমায় বুদ্ধি করে রুল টানা খাতাটা দিয়েছিলেন নইলে কি যে অবস্থা হতো, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। শালা, নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারে না তার আবার সাহিত্যক হওয়ার ইচ্ছে, যতসব পাগলামি। আমি প্রায় মুষড়ে পড়েছিলাম, যেই না সরস্বতী ঠাকুরের নাম মনে মনে জপতে শুরু করেছি, তখনই একটি ইন্টারেস্টিং আইডিয়ার কথা আমার মাথায় চলে এল।

ম্যাকউইলিয়াম স্কুলের এই অনুষ্ঠানের দু'বছর আগে থেকে শীতকালে আলিপুরদুয়ার জংশন ডি আর এমের মাঠে, রেলওয়ে অফিসারের গিন্নিদের 'উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন' নামের একটি মেলা হত। সবকিছুর মধ্যে ওদের বিশেষত্ব ছিল, ওরা মালিগাঁও অর্থাৎ উত্তর-পুর্ব রেলওয়ের হেড অফিস থেকে দুটি DOS Based কম্পিউটার নিয়ে আসত। ওই কম্পিউটার দুটিতে প্রথম যে খেলাটি ছিল সেটা সম্ভবত TANK তারপর এল MARIO, সে সময় মাউসের প্রচলন ছিল না। কি-বোর্ড দিয়ে খেলতে হত। তখন একটি কম্পিউটারের ভাড়া ছিল সম্ভবত ঘন্টা প্রতি দু'টাকা, শেষ দিকে হয়তো পাঁচ টাকা করে ছিল। আমি ও আমার ছেলে দুজনে মিলে রোজ প্রায় আট ঘণ্টা ধরেই খেলতাম। নতুন নতুন ভীষণ ভালো লাগত। আমি ফেল করা ছাত্র হিসেবে খেলা ছাড়তে চাইলেও ছেলে কখনো উঠতে চাইত

না। কি আর করা যাবে, কি-বোর্ডে বারবার ক্লিক ক্লিক করে যাও, কখনো হাঁসটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁধা পার হতে পারছে কখনো আটকে যাচ্ছে, এই আর কি। আটকে গেলে আবার নতুন করে শুরু করো। আমি অবশ্য কখনো এ খেলায় তেমন একটা ওস্তাদ হতে পারিনি বটে – তবে ছেলে লাস্ট স্টেপ পেরিয়ে গিয়ে থেমে ছিল। অর্থাৎ তখনকার কম্পিউটারে সেই খেলার ভেতরের গল্প (সফটওয়্যার প্রোগ্রাম), শেষ করে ফেলেছে। সত্যি কথা হল, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তার কম্পিউটারে খেলার জন্য যে গল্প লিখেছিলেন তাতে তাঁর আর দোষ কোথায়, যে তাঁর গল্প গুছিয়ে পড়তে পারে, সে পাশ করে যাচ্ছে – আর আমার মতো যারা দু চোখ কেন চার চোখ দিয়ে এই গল্প পড়তে পারে না তাদেরকে জনগণ কি বলে যে ডাকবে সেটা ওরাই জানে।

ইউরেকা, ইউরেকা। এতক্ষণে আমার মনটা একটু শান্তি পেয়েছে। সরস্বতী ঠাকুর যেন ইশারায় আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন – "বাছা তুমি লিখে যাও, যেমন খুশি লিখে যাও, যাদের চোখ আছে তারা তোমার লেখা ঠিক পড়ে নেবে। তবে তুমি যাতে ভবিষ্যতে নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারো দয়া করে ওদিকটায় একটু নজর রেখো।" 'জয় মা সরস্বতী' বলে আবার নতুন উদ্যমে লেখা শুরু করলাম, রাত শেষ, খাতা শেষ, আমার গল্প লেখাও শেষ। সরস্বতী ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে খাতা কলমকে সযত্নে উঠিয়ে রেখে, গেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে এসেছি।

টুকরো স্মৃতি

আহা সকালটা কি সুন্দর! মন্ডপ দালানের উঠোনে ভোরের আলোতে কিছুক্ষণ লম্বা পায়চারি করে ঘরে ফিরে এসেছি। গিন্নি আমায় চা বিস্কুট দিয়ে বললেন "সাপ ব্যাঙ কিছু হল?"

আমি বললাম – যা হয়েছে ভালই হয়েছে, আমার গর্ব হচ্ছে যে আমি ভবিষ্যতে কবি-সাহিত্যকের দলে নাম লেখানোর দোরে দাঁড়িয়ে আছি, তবে আমাকে আজ সকাল সকাল একবার অফিস যেতে হবে।

অনেকক্ষণ হল পি. ডব্লু. অফিসে এসেছি। আজকে অফিসে আমি একদম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। সারাক্ষণ শুধু মনে হচ্ছিল কখন সন্ধ্যা নামবে আর আমি সবুজ মলাটের এক্সারসাইজ খাতাটি নিয়ে হেড স্যারের সামনে হাজির হব।

সন্ধ্যে ছ'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি গতকালের পোশাকে তৈরি হয়ে কলমটা বুক পকেটে গুঁজে যেই না হাতে খাতাটা ধরেছি, দেখি মলাটে গল্পের নাম লেখা নেই তারপর লেখকের নামও নেই, যদি এই অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণে এই অসাধারণ গল্পটা কোন কারণে একবার হারিয়ে যায় তবে আমার জীবনটাই যে বৃথা হয়ে যাবে। না না শিগগির এই ঐতিহাসিক সৃষ্টির একটি নাম দিতে হবে। আর দেরি নয়, মলাটে ছাত্ররা যেখানে নাম লেখে সেখানে গল্পের নামটি গট করে বসিয়ে দিলাম। তার নীচে আমার একখানি কেউকেটা সিগনেচার। মনে মনে ভাবলাম এতক্ষণে এই অসাধারণ লেখাটি উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে। খুব আনন্দ হচ্ছিল।

...ক্রমশ ■

মেলর্বোনের পর সিডনিও কি দেখবে ভারতীয় রূপকথা!

সুজন ভট্টাচার্য

শুরু থেকেই রহিত শর্মা এবং ঈশান্ত শর্মার মতো তারকা শূন্য হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দেশের মাটিতে পা রাখা, তদুপরি ক্যাপ্টেন বিরাট কোহালিকে দেশে ফিরার অনুমতি এবং মহম্মদ শামির চোটগ্রস্থ অবস্থায় দল থেকে বাদ পড়ার পর যেভাবে সিডনি টেস্টে বহুনিন্দিত ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর মেলর্বোনে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াল, তা দেখে খ্যাতনামা অস্ট্রেলীয় ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার সহ গোটা বিশ্ব শুধু মুগ্ধই নয়, স্তম্ভিতও বটে।

মেলর্বোনে বক্সিং ডে টেস্টে ভারতীয় দলের বিজয় শুধু এদেশে নয়, পেছন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর এক রূপকথা হয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসের পাতায় চির অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মতে এই জয় কোনো অংশেই ১৯৮৩-এর বিশ্বকাপ জয়ের থেকে কম নয়। বেশ ক'টি কারণে এই জয় অসাধারণ।

প্রথমতঃ সিডনি টেস্টে পরাভূত ভারতীয় দলের দ্বিতীয়

ইনিংসে করা "৩৬/৯" স্কোরটি এদেশের সুদীর্ঘ ৮৮ বৎসরের ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বনিম্ন মোট রান। স্বাভাবিক ভাবেই দলের মনোবল তলানিতে থাকার কথা।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিপুর্বে পূর্ণ বলে না থাকা দলের ক্যাপ্টেন এবং প্রথম সারির এক বোলারকে মাঝ রাস্তায় হারিয়ে ফেলা ছিল এক প্রবল নেতিবাচক, দলের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেবার মতো ধাক্কা।

তৃতীয়তঃ, সদ্য নিয়োজিত ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানেসহ দলের একাধিক প্রথম সারির ব্যাটস্ম্যানদের ব্যর্থতা অথবা ফর্মে না থাকা।

এসব প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠে, রাহানের অসাধারণ নেতৃত্বে ভারতীয় দল যেভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ানোর দৃড়সংকল্প এবং উদ্দেশ্যে অনড় থাকার চরিত্র প্রদর্শন করল – সেটা সত্যিই হতবাক করার মতো বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

রাহানের চোখে পড়ার মতো নেতৃত্ব ছাড়াও তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা লড়াকু ১১২ রানের ইনিংস, টেস্ট অভিষেকপ্রাপ্ত সুভমন গিল ও মহম্মদ সিরাজের অসাধারণ প্রদর্শন এবং অন্যান্য সিনিওর বলারদের দাপটে অস্ট্রেলিয়া মেলর্বোনের মাটিতে চতুর্থ দিনের শুরুতেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

অনেক লড়াই করে উঠে আসা দুই নতুন প্রতিভা গিল এবং সিরাজের উত্থানের কাহিনী তরুণ ক্রিকেটারদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

অস্ট্রেলিয়ার পিচ এবং পরিবেশ সম্পর্কে আগে থেকে বিশ্লেষণ করে সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়াই রাহানের সাফল্যের আসল কারণ বলে মনে করেন তাঁর কোচ প্রবীণ আমরে। দ্বিতীয় টেস্টে রাহানের ইনিংসের তারিফে গোটা বিশ্ব মুখরিত – আর কোচ রবি শাস্ত্রীর মতে ওটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

ভারত দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করল। গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ায় পর অনেক সময় বাকিদের আত্মবিশ্বাস থিতিয়ে যায়। হয়তো গোটা বিশ্বই ভেবেছিল কোহালি এবং শামির অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের সিরিজে ফেরা কঠিনই নয় প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে কখনো কখনো দলের বাকিরা মরিয়া হয়ে ওঠে, ওদের মধ্যে একটা জেগে ওঠা এবং করে দেখানোর খিদে পেয়ে বসে। সেটাই ভারত করে দেখিয়েছে।

চোটগ্রস্থ হয়ে শেষ দু'টি টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়া উমেশ যাদবের পরিবর্তে দলে আসা বাঁ-হাতি মিডিয়াম পেসার নটরাজনের সিডনিতে টেস্ট ডেবুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মোটের ওপর ভরবেগ অর্থাৎ মোমেন্টাম ভারতের আনুকুল্যে, আর এইমুহূর্তে রাহানের সৈন্যরাও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। সিডনির দর্শকেরা কি আরেকটা ভারতীয় রূপকথার অপেক্ষায় রইল? ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ বন্দে মাতরম...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ বয়সঃ ৯ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৬)

প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়া, কিছু ফিরে পাওয়া কিংবা হারিয়ে ফেলা, হয়তো বা দীর্ঘ প্রতীক্ষার আহ্বান, আবার রোজনামচার দিনলিপি — সব কিছুরই নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে প্রতিটা ব্যস্ত রেলস্টেশন। এককালে কাঁচা মাটির রাস্তা চিড়ে দু'লাইনের যে হাওড়া স্টেশন গড়ে উঠেছিল, তা এখন তার শিরা-উপশিরা নিয়ে দূর থেকে দূরতম যাত্রার উৎসস্থল হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, সময়ের সাথে সাথে এর আড়ম্বর, প্রকল্প ও সাযুজ্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে; ভবিষ্যতে আর ঘটবে। ব্যস্ততম রেলস্টেশনে অপেক্ষারত ব্যস্ত যাত্রীরা এখন মুঠোফোনে মগ্ন থাকেন। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে রেলস্টেশনের সেই ছোট ছোট বুক স্টলগুলি। হয়তো কয়েক বছর পর এগুলো লেখা থাকবে লেখকের গল্পে কিংবা পুরানো ইতিহাসের পাতায়। তবে এখনও গুটি কতক পাঠকের মতো পিকুও বুকস্টল থেকে কিছু বই বাছাই করছে, ট্রেনে বসে পড়বে বলে। বিকাল ৫ টায় তার ট্রেন। এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে।

একদিনের মধ্যে টাকা জোগাড় করা, গুছানো আর রওনা

হওয়া — সব কিছু যে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ করা গেছে, এই ভেবে পিকু একটু নিশ্চিত ও আশস্ত হতে পেরেছে। আর এখান থেকেই একটা মেস যে এতো তাড়াতাড়ি বুক করা গেছে সেটা খুব কাজের হয়েছে। বই কিনে ওয়েটিং জোনে বসে, হঠাৎ করে তার মনে পড়ল রোহিণীর কথা। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখে ব্যাটারি নেই। ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশনে চার্জে বসিয়ে পিকু ম্যাগাজিনটা খুলে পড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর পিকু মনে মনে ভাবতে লাগলো, “ইস, খুব ভুল হয়ে গেছে, রোহিণীকে আমি তো কিছুই জানাইনি। আর ফোনটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও খুব চিন্তা করছে হয়তো। আর এতো ভালো খবরটা আমি ওকে জানাতে কি করে ভুলে গেলাম। খুব ভুল হয়ে গেছে। এখনি ফোন করতে হবে ওকে। দেখি কতটা চার্জ হল” এই বলে ফোনটা চালু করে সে রোহিণীকে ফোন করে। কিন্তু রোহিণীর ফোনটা বারাবার বন্ধ বলে প্রত্যুত্তর আসে। এদিকে ট্রেন এসে যায়। পিকু কলকাতা শহরকে বিদায় জানিয়ে নতুন স্বপনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

##

দশটা বছর কেটে পিকু এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তার সংসারে আর সেই অভাব-অনটন নেই। পিকুর বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তার বাবা-মা এখন দিল্লিতেই থাকেন। আর সাথে স্ত্রী। পিকুর এখন নিজের ব্যাবসা। শুধু দেশে নয়, দেশের

বাইরেও তার যোগাযোগ। তাই ঘরে তার থাকা হয় না। এক দু'মাস অন্তর হয়তো সে বাড়ি আসে। পিকুর স্ত্রী তনিমাও একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরতা। ওদের বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। তারপর পাঁচটা বছর কেটে গেছে, কিন্তু ওদের মধ্যে মানসিক বন্ধুত্ব আজও গড়ে ওঠেনি। গড়পড়তা জীবন স্রোতে ওদেরও ব্যস্ত জীবন বয়ে যাচ্ছে।

দিল্লিতে চাকুরি সূত্রে আসার পর পিকু আর কোনভাবেই রোহিণীর সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। ফেসবুক, ফোন সব কিছু থেকে রোহিণী পিকুকে ব্লক করে দিয়েছিল। আর তাছাড়া কর্মব্যস্ততা, নতুন বৈভব, পরিবারে প্রতি দায়িত্ব, উন্নতির শিখর ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে রোহিণী তার কাছে যেন কোন দূরতম আলোকবর্ষের মেঘে ঢাকা তারার মতন প্রচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর সেই পথে চলতে চলতে সে পাশে পেয়েছে তনিমাকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সুন্দরী, বৈভব পিয়াসী। পিকুর জীবনে এখন সব আছে। নিজেস্ব ব্যাবসা, প্রতিপত্তি, বিলাসিতা... কিন্তু তবু কিছু একটা যেন নেই। কি নেই, বা কি আছে তার হিসাব কেই বা রাখে! তবে বিরাট প্রাপ্তির মাঝেও যে অগাধ শূন্যতা থেকে যায়, তার খবর হয়তো অনুধাবন করা না গেলেও অনুভবে থেকে যায়...

গত এক সপ্তাহ হল পিকু এখন দিল্লিতেই নিজের পরিবারের সাথে আছে। অনেক দিন পরে একটু টানা এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে সে। সামনের খোলা বারান্দায় বসে

কফি খেতে খেতে খবরের কাগজটা পড়ছে সে, ঠিক সেই সময় তনিমা এসে বলল, “পিকু, আমার যে দাদা আরবে থাকে, তার কিছু বন্ধু ও সেই বন্ধুদের চেনা জানা কয়েকজন এখানে আসবেন, ওঁদের থাকা আর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখানোর দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে, অন্য কারোর হাতে দিলে হবে না, বলে দিলাম। হ্যাঁ, এই ট্যুরে আমিও থাকব তোমার সাথে। এই অজুহাতে আমাদের দুজনের এক সাথে ঘোরা হয়ে যাবে। কত দিন কাজের চাপে একসাথে বেরোনোর সুযোগই হয়না। কি বল তুমি?”

পিকু কফির কাপটা টেবিলের উপর রেখে বলল, “কবে আসছেন ওনারা, আর কত দিন থাকবেন সেইসব ডিটেলস আমাকে মেল করতে বলো। কারণ পরের মাসে আবার আমার একটা ফরেন ট্যুর আছে।”

— হ্যাঁ, ওনারা তিনদিন পরই ইন্ডিয়াতে আসছেন। আমাকে সব মেল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি এখনি তোমাকে পাঠাচ্ছি।

— আচ্ছা। পাঠাও আমি দেখছি বাকিটা। আর হ্যাঁ, আমাদের ট্যুর প্যাকেজের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছ তো?

— আরে হ্যাঁ, সব বলেছি। তবে জানো দাদা আসবে না।

— তা ওনারা কতজন আসবেন?

— আটজন, দুটো ফ্যামিলি, আর তিনজন বন্ধু।

##

সকাল সকাল উঠে পিকু তৈরি হয়ে নিচ্ছে। আজ অনেক কাজ, তনিমার দাদার বন্ধুরা এসে গিয়েছেন। তাদের শহরটাকে ঘুরে দেখাতে হবে। অনেকদিন পর তনিমাও সাথে যাবে। "কি তনিমা তোমার হল? আরে ওনারা ওয়েট করে আছেন। তাড়াতাড়ি বেরতে হবে।"

তনিমা বিষণ্ণ মুখে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে বলল, "আমার আর যাওয়া হবে না। বস একটা নতুন প্রজেক্টের ভার দিয়েছে। সেটা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দিতে হবে। তুমি যাও, যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করে, আই উইল জয়েন ইউ। তুমি একটু কদিন ম্যানেজ করে নাও, প্লিজ...।"

পিকু একটু রেগে গিয়ে বলল, "তোমাকে আর জয়েন করতে হবেনা। নিজের খেয়াল রেখো। আমি এলাম।" সে বেড়িয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে।

পিকু তার হোটেল 'গোল্ড মাইন্ড'এ এসে পৌঁছাল। সেখানে গেস্টরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একজন স্বামী-স্ত্রী, আর একটা ১৬ বছরের ছেলে। আরেকজন নব দম্পতী, আর তিনজন অবিবাহিত ছেলে। আলাপ পরিচয়ের মাঝে পিকুর চোখ গিয়ে পড়ল, আরেকটা চোখের ওপর। বিবাহিতা মহিলাটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিকুর দিকে। তার চাহনিতে যেন একটা অন্য মোহময় নেশা। পিকু কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে চোখ নামিয়ে নেয়। তখন মহিলাটি অকপট ভাবে সামনে এসে বলে, "হ্যালো আমি

কেয়া। আমার হাসবেন্ডের সাথে এইমাত্র আলাপ করলেন। রাহুল আর আমার এই ছয় মাস আগে বিয়ে হয়েছে। আমি জন্মসুত্রে ইন্ডিয়ান হলেও ইন্ডিয়ায় আসা হয় নি। রাহুল আসে, কিন্তু আমার এই প্রথম আসা। মিস্টার বসু (পিকু) পুরো শহরটা ঘুরে দেখতে চাই। আপনি কিন্তু তার আগে ছুটি পাবেন না।"

পিকু একটু হেসে বলে, "হ্যাঁ ম্যাডাম অবশ্যই। আপনারা সকলে আমাদের অতিথি। আপনাদের অ্যাপায়নে ত্রুটি হলে সেটা আমাদের কাছেও খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। গাড়ি এসে গিয়েছে চলুন রওনা দেওয়া যাক।" ওদের গাড়ি আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

...ক্রমশ ■

মাথা বদল

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

ছোট বেলায় দেখা এক 'পাপেট শো'র একটা মজার দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার খুব মজা লাগে। সালটা সম্ভবত ১৯৭৪, আমাদের সাঁতরাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে এক দক্ষ পুতুল খেলা দেখানোর শিল্পী তাঁর পুতুলদের মাধ্যমে একটি মজার নাটক পরিবেশন করছেন। নাটকে এক ব্যক্তি ডাক্তারের কাছে এসে বলছেন, "ডাক্তার বাবু আমার মাথাটা একটু দেখুন। আর পারিনা, বড় যন্ত্রণা হয়।" ডাক্তারবাবু তাঁর মাথাটা দু'হাতে ধরে নারকোলের জল বোঝার মত করে বেশ কয়েকবার ঝাঁকিয়ে বললেন, "এর মধ্যে তো আর কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। তা এটাকে নিয়ে যখন এত কষ্ট, এটা বদলে নিন না।" সেই ব্যক্তিটি তারপর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কি রকম কি রকম মাথা পাওয়া যেতে পারে..." ইত্যাদি। আমরা সে যুগে আর সেই বয়সে দাঁত তোলা, বড়জোর ভাঙ্গা হাড়ের জায়গায় 'স্টীল'এর 'রড' বসানোর কথা শুনেছি, কিন্তু মাথা বদলানোর ব্যাপারটা তখন আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। আমি মঞ্চে সেই মাথা বদলানোর 'অপারেশন'

দেখে এসে, খুব উৎসাহের সাথে সেই নতুন পদ্ধতির কথা বাড়িতে বলেছিলাম। বাড়ির বড়রা অনেকেই তা শুনে খুব হেসেছিলেন। কিন্তু স্কুলের প্রোগ্রামে যখন দেখানো হয়েছে, তা কি মিথ্যা হতে পারে! বলা বাহুল্য, সেটা 'গুগল'এর যুগ নয়, তাই যেমন সবেতেই বাড়িতে বলা হত 'বড় হও লেখাপড়া শেখো, নিজেই জানতে পারবে, মাথা সত্যি বদলানো যায় কিনা...' তাই শুনে বড় হয়ে জানতে পারার আশাতেই তখনকার মতো দমে গিয়েছিলাম। আর বড় হতে হতে প্রশ্নটাও কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ যখন ১৭ই নভেম্বর, ২০১৭ তে 'নিউইয়র্ক পোস্ট'এর একটি পাতায় দেখলাম, এক প্রফেসর বলছেন যে – পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য মস্তিস্কের প্রতিস্থাপন (হিউম্যান হেড ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) সাফল্যের সাথে সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে, তখন আবার অবচেতন মনের কোনো অংশ থেকে সেই অতি পুরাতন প্রশ্নটি সচেতন মনে ফিরে এল। আমার ছোটবেলার প্রশ্নটি দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আবার নতুন করে শুরু করলাম আমার ছেলেবেলার প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা।

হেড ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বা মস্তিস্ক প্রতিস্থাপনঃ ব্যাপারটির একটি ছোট্ট ও সুন্দর সংজ্ঞা উইকিপিডিয়াতে কেউ লিখেছেন, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় – এটি একটি পরীক্ষামূলক অস্ত্রোপচার যার দ্বারা কোন একটি জীবের

মস্তিস্ক অপর কোন জীবের দেহে প্রতিস্থাপিত করা হয়। কিছু পরীক্ষায় গ্রহীতার মস্তিস্ক ছেদন না করেই দাতার মস্তিস্ক তার দেহে বসানোর প্রচেষ্টা হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে গ্রহীতার মস্তিস্ক ছেদন করে সেখানে অন্য জীবের মস্তিস্ক বসানো হয়েছে। যদিও ১৯০০ শতাব্দী থেকেই এইরকম বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে, তবুও ২০২০ সালের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই কোন দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য দেখা যায়নি। তবে, এন.সি.বি.আই. এর একটি 'রিপোর্ট' (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6511668/) থেকে জানা যায় যে – ১৯৭০ সালে রবার্ট হোয়াইট প্রথম যে 'সিফালিক এক্সচেঞ্জ ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন' করেন, তাতে একটি বাঁদরের মাথা আর একটি মুণ্ডুকাটা বাঁদরের ধড়ে বসান হয়, এবং তারপর বাঁদরটি আট দিন বেঁচে ছিল, এবং তার শব্দ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির স্বাভাবিক বোধগুলিও ফিরে আসছিল।

হিউম্যান হেড ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনঃ 'নিউইয়র্ক পোস্ট'এর ঐ প্রবন্ধটিতেই উল্লেখ করা হয়েছিল, যে ইতালির ডাঃ সেরগিও কানাভেরো (Dr. Sergio Canavero, Chief of the Turin Advanced Neuromodulation Group) যখন ২০১৫ সালে তাঁর পরিকল্পিত অস্ত্রোপচারটির পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন তখন তিনি এক দিকে তাঁর অভূতপূর্ব পরিকল্পনাটির জন্য অনেক বাহবা পান, অন্য

দিকে এক নতুন ‘ফ্রাঙ্কেস্টাইন’এর ভাবী-জন্মদাতা হিসাবে বিশেষ কুখ্যাতিও লাভ করেন।

যা হোক, ২০১৭র নভেম্বরে, ‘নিউইয়র্ক পোস্ট’এর সাংবাদিকদের তিনি জানান যে – এই অস্ত্রপ্রচারটি সম্পাদিত হয়েছিল চীনে। সেখানকার হারবিন মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (Harbin Medical University) শল্যচিকিৎসকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে – তাঁর বিবৃত পদ্ধতিতে বিচ্ছেদনের পর মেরুদণ্ড, স্নায়ুতন্ত্র এবং রক্তনালী সমূহের পুনঃসংযোগ সম্ভব। ডাঃ কানাভেরোর বক্তব্য অনুযায়ী, ডাঃ জিয়াওপিং রেন (Dr. Xiaoping Ren, of Harbin Medical University), যিনি ১৯৯৯ সালে আমেরিকায় প্রথম হস্ত প্রতিস্থাপন ‘অপারেশন’এ সহায়তা করেছিলেন, ২০১৬ সালে সাফল্যের সাথে একটি বাঁদরের দেহে নতুন মস্তিস্ক প্রতিস্থাপনে সক্ষম হন। পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য মস্তিস্কের প্রতিস্থাপন ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করে, জেনেভার একটি সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ কানাভেরো বলেছিলেন যে – আসলে একটি শবদেহের ওপর অপর একটি মস্তিস্ককে যথাযথভাবে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কটাক্ষের উত্তরে তিনি জানান, বৈদ্যুতিক উদ্দীপক (electrical stimulation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরে এই ‘অপারেশন’এর সাফল্যও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরে সম্পূর্ণ ‘অপারেশন’টির ভিডিওও তাঁরা পেশ করে ছিলেন।

এ ধরণের 'অপারেশন' করার প্রয়োজনীয়তাঃ যখন কোন প্রান্তিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে, কোন অল্পবয়সী মানুষের 'ব্রেন' কাজ করলেও শরীর অক্ষম হয়ে যায়, তখন এই জাতীয় 'অপারেশন' জরুরী হয়ে পড়ে। রোগের উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারেঃ 'প্রোগ্রেসিভ মাস্কুলার ডাইস্ট্রোফিস (Progressive Muscular Dystrophies) – যাতে ক্রমে ক্রমে মাংসপেশীর ভর কমতে থাকে।

ডাঃ কানাভেরোর পদ্ধতি ও তার সমালোচনাঃ এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে দাতার এবং গ্রহীতার মেরুদণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন (Sever) করা হবে একটি হীরার ব্লেড (Diamond Blade) দিয়ে। 'ব্রেন'টিকে 'অপারেশন'কালে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে প্রগাঢ় 'হাইপোথার্মিয়া'র (অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা শারীরিক তাপমাত্রা) অবস্থায় ঠাণ্ডা করে রাখা হবে। সব শেষে, 'পলিইথাইলিন গ্লাইকল'এর (polyethylene glycol substance or PEG) প্রয়োগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মেরুদণ্ড ও নতুন মস্তিস্ককে জোরা দেওয়া হবে।

যদিও ২০১৭ তেই ডাঃ কানাভেরো ও তাঁর সহচররা জীবিত মানুষদের ওপর এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু আজও পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে।

এটা শুধু শল্যচিকিৎসার নৈপুণ্য বা সাফল্যের বিষয় নয়, এই 'অপারেশন'এর ফলে একটি 'ব্রেন'কে কাজ করতে হবে

একটি অপরিচিত শরীর নিয়ে। এ বিষয়টি কতটা নৈতিক এবং মানসিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, বিভিন্ন মহলে তা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। এই নতুন অবয়বের প্রতিরোধক ক্ষমতা (Immunological Dilemma) নিয়েও একটা বড় প্রশ্ন উঠেছে।

কি হতে চলেছেঃ যদিও ডাঃ কানাভেরোর বার্তা অনুযায়ী তাঁদের প্রথম রোগী ২০১৭ সালেই, চীনেই এই 'অপারেশন'এর জন্য তৈরি ছিল, কারণ আমেরিকাতে বা ইউরোপে কেউই তাঁর পদ্ধতিটির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি – এবং তাঁরা শুধু এই পদ্ধতির বিপক্ষেই কথা বলে চলেছেন। কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি।

ডাঃ হুয়াং জাইফু (Dr. Huang Jiefu), চীনের একজন প্রাক্তন সহকারী স্বাস্থ্যমন্ত্রী সি.এন.বি.সি.র সাথে এক 'ইন্টারভিউ'তে জানিয়েছেন যে – যখন মেরুদণ্ড কাটা হয়, তখন স্নায়ুকোষগুলি (neurons) আর জোরা দেওয়া যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতিটিই ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই ঠিক কবে ডাঃ কানাভেরো এবং ডাঃ রেন জীবিত মানুষের ওপর তাঁদের প্রথম অপেরাশনটি করতে পারবেন এবং তার ফল কি দাঁড়াবে, তা এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। তবে আমেরিকা এবং ইউরোপ-এর বেশিরভাগ ডাক্তার বা বিজ্ঞানীরাই মেরুদণ্ডসহ মস্তিস্ক বদলের পদ্ধতির সপক্ষে তাঁদের রায় দিচ্ছেন।

(আরও জানতে হলেঃ https://www.youtube.com/watch?v=_EHCHv5u3O4) ■

বিশ্বাস

জয়তী গাঙ্গুলী

বিশ্বাস শব্দটা আজ শুধুই
সস্তা পন্যসামগ্রী।
যেটা বস্তাপচা মূল্যহীন বস্তু,
কিন্তু মানুষ এই শব্দটার জন্য
ছুটে যায়...
একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।
ঠকে যায়, তবু বিশ্বাসে 'বিশ্বাস' রেখে
চলতে চায়।

কখনো কখনো মন তীব্র প্রতিবাদ করে,
ভেতরের মানুষটা তবু
স্থিরভাবে তাকেই আঁকড়ে থাকে।
হয়তো ভাবে বিশ্বাসটুকু মরে গেলে
বাঁচবে কীভাবে!

আমরা কী সত্যিই বেঁচে আছি,
না বেঁচে থাকার অভিনয় করছি?
শ্রদ্ধা, সম্মান, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা
সবই আজ একটা কাল্পনিক
আনন্দের সমাহার।

কলিকাল

যে যত ভালো অভিনয় করে
সে তত হাততালি পায়...
আর যে পারে না,
মৃত মানুষের ধ্বংসস্তূপে
হারিয়ে যায়। ■

‘গুঞ্জন’এর ২০২১ এর বাকী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

ফেব্রুয়ারি – প্রেম সংখ্যা (কাজ চলছে)

মার্চ – নারী সংখ্যা

এপ্রিল – বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা

জুলাই – রহস্য রোমাঞ্চ ও কল্প কাহিনী সংখ্যা

অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

অক্টোবর – পূজা সংখ্যা

নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

গরমিল

প্রণব কুমার বসু

ইস্তিরি আর স্ত্রী এই দুয়ের মধ্যেই যে এত মিল কে জানতো! এইতো কিছুদিন আগে টিভি, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন দেখে অনেক দোকান ঘোরাঘুরি করে একটা ইস্তিরি নিয়ে আসলাম — ঠিকমতো চালু করার আগে বেশ কয়েকবার ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল পড়তে হ'ল — খুব ছোট করে সব ইংরেজি, হিন্দি আর উর্দু ভাষায় লেখা, বাংলার নামগন্ধও নেই।

আমাদের সময় এত ঝামেলা ছিল না। বেশ ভারী ছুঁচলো মুখওয়ালা মিশমিশে কালো লোহার ইস্তিরি কয়লার উনুনে রেখে গরম করে নিলেই চালু — ম্যানুয়াল নামক বস্তুই ছিল না। আর একটা ঝামেলা হল একটা রেগুলেটর আছে। ইস্তিরি গরম করার আগে জানতে হবে কী ধরনের কাপড় ইস্তিরি করতে চান — লিনেন, কটন, উলেন না অন্য কিছু অন্যথায় সমূহ বিপদের আশঙ্কা!

বিবাহের পূর্বেও প্রায় একই অবস্থা! অনেক দেখেশুনে নানাভাবে খোঁজ খবর নিয়ে জ্যোতিষীকে দিয়ে ঠিকুজি-কুষ্ঠি মিলিয়ে স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক খবর নিয়ে ঘরে আনা হ'ল সুশ্রী সর্বগুণে গুণবতী শিক্ষিতা এক তন্বীকে। অমিল

একটাই সঙ্গে কোনও ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল ছিল না।

প্রথম প্রথম বেশ ঠিকঠাকই সব চলছিল। তারপর আবার ইস্তিরি আর স্ত্রীর মিল খুঁজে পেলাম গত পরশুদিন। অফিস থেকে গলদঘর্ম হয়ে ফিরেছি মাঘ মাসে — কারণটা অফিসে বসের ঝাড় খাওয়া। স্বদর্পে টেবিলে অফিসের ব্যাগটা রাখতে গিয়েই খেলাম নতুন ইস্তিরির ছ্যাঁকা। কে জানতো ইস্তিরি তখনও গরম রয়েছে! রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে লেপের মধ্যে কখন অজান্তেই হাত লেগে গেছে স্ত্রীর বিশাল দেহের এক ক্ষুদ্র অংশে — ব্যাস! এবার সরব ছ্যাঁকা!

“সারাটাদিন খেটেখুটে রাতে একটু আরাম করে শোবার ও জো নেই।” ইস্তিরি এনেছি ইন্সলমেন্টে — স্ত্রীও যদি ঐ বিশেষ পদ্ধতিতে আনা যেত! ■

ছবির নামঃ ডুমুর জলার ভোর...

চিত্র গ্রহণেঃ রাজশ্রী দত্ত

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আশা

এই প্রভাতী কিরণ মাঝে মেঘের ভেলায়,
জড়িয়ে আছে আমার আপন হৃদয়ের স্পন্দন।
যদি কখনও ফিরে আসি আবার হেথায়,
ফিরে পেতে চাই ফেলে যাওয়া সব আনন্দক্ষণ।

~ হাজেরা বেগম

লেখক সূচী

লেখক সূচী

লেট'স হোপ

সন্দীপ বাগ

মানুষগুলো থমকে ছিল ভয়ে
দিন পেরিয়ে মাস পেরিয়ে বছরভর
পৃথিবী তো থেমে ছিল না।

সূর্য চাঁদ গ্রহ তারা
পশু পাখি গাছপালা
নদ নদী গিরি পর্বতমালা
নিবিড় আলিঙ্গনে ছুটছিল বেশ।

সবার ওপরে মানুষ যেমন সত্য
মানুষে মানুষে তীব্র বিভেদ তেমনই সত্য
অপরিমেয় লোভ লালসা,পরিত্যক্ত জীবনবোধ
অহংকার মত্ত একঘরে ক্লান্ত স্তব্ধ মানুষ
শেষে খুঁজে ফেরে নিজেকে
প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির সৃষ্টিতে।

বিশের বিষে শরীর মন যখন তছনছ
একুশে তখন পড়িমরি নীলকণ্ঠের খোঁজ
নতুন করে বাঁচবে সব্বাই
আছে যত জগতের কীট
ছন্দ মিলিয়ে নতুন হয়ে
আবার ছুটবে পৃথিবী
লেট'স হোপ। ■

বই

মুল্যঃ ৮০ টাকা [এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ডেলিভারি চার্জ লাগবে।]

লিঙ্ক (Just copy and paste to your browser):
https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

পত্রের আড়ালে

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

নীলাঞ্জনা,

প্রেতশীলার চূড়ায় নির্দেশ পেয়েছিলাম আমার আমিত্ব বর্জন করার, পারলাম কৈ! যে প্রশ্নের উত্তর পাই নি তা হল কিসের নেশায় আমার ছোটা? মানুষ হয়ে মানুষ খোঁজ হারাল নাকি সুন্দরের সন্ধানে?

হুণ জাতি বিশ্বাস করত, "পুরুষের বিপদের অধঃপতনের মূলে তিনটি কারণ। অসির নখ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষ।" হুণ জাতি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে, সঙ্গে নিয়েছে অসির নখ। ঘোড়ার পিছনের পায়ের রূপান্তর হয়েছে। তৃতীয়টি, প্রতিটি জিনিসের ভালমন্দ আছে, আমরা মন্দটিকে বড় বেশী জোর দিয়ে ফেলি। ভাল এটাই যে মানুষের মাঝে মানুষ খোঁজার এক নতুন উদ্যম এনে দিয়েছে আমার মধ্য।

তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে – তবে এ দৈন্যবেশ কেন? চাকরি তো আমাকে অনেক আগেই বৈধব্য দান করেছে। ব্যবসা? যা করেছি তাতে এটুকু পরিস্কার ওটা আমার জন্য নয়। আমার জন্য হলে হয়তো ঘর ছাড়ার প্রয়োজন হত না। যাক সে কথা — বাস্তবিক আজ আমি কপর্দকশূন্য। আসলে দৈন্যতার মধ্যে ডুব না দিলে দৈন্যতা

চিঠিপত্র

জানব কিভাবে!

বাংলার মাটিতে পা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম শরৎ ও আমার মত নিরুদ্দেশ। হারিয়ে গেছে নীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মতো ক্লান্তিহীন মেঘেদের উড়ে চলা। জীর্ণ মলিন শাড়ী পরা গ্রাম বাংলার অভাগী মেয়ের মত দাঁড়িয়ে কাশফুলেরা জানান দিচ্ছে, আমরা এসেছিলাম।

হাজির হয়েছি তরাই অঞ্চলে। এখানে হেমন্ত কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই দুরন্ত। ভোর রাত্রে টিনের চালে শিশিরের ভৈরবী, ভোরের ঘাসে পা ভেজা। দেরাজ থেকে আলোয়ানের মুক্তির দাবিতে হেমন্তের হিম সন্ধ্যে থেকে সোচ্চার। যেখানে রয়েছি সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াটি দেখা যায় পরিস্কার। সূর্য্যদেব তার সাম্রাজ্য বিস্তার করার কিছু পূর্বে রক্তিম রং ঢেলে দেন এর চূড়ায়, তার রূপে মুগ্ধ হবার সাথে সাথে সে হয়ে ওঠে কাঞ্চনবর্ণ। তার রূপের হাতছানি হার মানায় যে কোন সুন্দরীর চোখের ঝিলিককেও। একটু বেলা বাড়ার সাথে সাথে তার রূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন সে পূর্ণ যৌবনা। আরেক দিকে রয়েছে ভূটান পাহাড়। তার চূড়ায় সব সময় মেঘেদের লুকোচুরি খেলা।। সন্ধ্যের পর দূর পাহাড়ের গায়ে এক অপূর্ব মাদকতা। পাহাড়ের সব বাড়িতে জ্বলে ওঠে আলো, এখান থেকে মনে হয় হাজার জোনাকির মেলা বসেছে। কি মনোরম দৃশ্য! না দেখলে অনুভূতিতেও আনতে পারবে না। অদ্ভুত এটাই যে দিনের আলোতে ঐ দূর পাহা-ড়ের কোন বাড়িই দৃষ্টিগোচর হয় না।। শ্রদ্ধেয় জোর্তিময় দত্ত

চিঠি

মহাশয় একবার বলেছিলেন, “প্রকৃতির শোভায় যাঁর হৃদয় নিদ্রিত থাকে, তাঁর ঘুম কোনো নবজাগরণই ভাঙ্গাতে পারবে না।” ঘুম ভাঙলে কি হবে তার সঠিক ব্যাখা নেই।

এটুকু বুঝতে পারি যার বাস্তবিক ঘুম ভাঙ্গবে, সে আমার মত এক উন্মাদ তৈরী হবে। গ্রামের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে ছোট্ট এক নদী, যাকে এখন একে নদী না বলে ঝর্ণা বলাই শ্রেয়। এর জলের স্রোত মন্দ নয়। ছোট ছোট পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলছে। অপূর্ব তার সুর লহরী। নদীর পাড়ে এক আমলকী গাছের তলায় আমার দিনটা বেশ কেটে যায়। গাছতলায় বসে অনুভব করি – যৌবনের নেই এখানে উন্মাদনা, অর্থ এখানে লালসা নয়, পার্থিব বস্তুর নেই হাতছানি। সবই প্রশান্ত, প্রশস্তি।

ফিরে যেতে হবে শহরের উজ্জলতায় নাকি পঙ্কিলতায় জানি না। আবার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। কাম, ক্রোধ, লালসা কোনো কিছুরই ঘাটতি থাকবে না। তবু শহর কলকাতা।

সুন্দর কে! এই দুষণহীন প্রাকৃতিক শোভা নাকি লাস্যময়ী শহরের উচ্ছ্বাস — জানা নেই। বলেছিলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, পারছি কই!

ভাল থেকো। চিঠি লিখো।

ইতি -

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

সম্পর্ক

সংহিতা ভট্টাচার্য্য

গর্ভ হ'তে জন্মে পেলাম,
দীর্ঘ ভ্রমণ তরী!
ঘরের মাঝে আঙিনাতে শুরুটা হামাগুড়ি!

সম্পর্ক প্রথম মায়ের সাথে
এরপরেতে বাবা।
একে একে যুক্ত হল দিদি ভাই বোন দাদা।

মামা-মামী মাসি-মেসো কাকা জ্যাঠা-জ্যেঠি
পাড়াপড়শি সাথে নিয়ে জুট'ল সহপাঠী।

বন্ধু বান্ধব আত্মীয়তা সবার সাথে যোগে
শ্বশুরবাড়ির ভ্রমনতরী স্বামীর সোহাগে।

কলেজ অফিস বাজার হাট মাঠে ঘাটে পথে,
বেড়েই চলে যোগ-সংযোগ নেইকো ক্ষতি তাতে।

পরেনা তো শ্বাস, রয় শুধু বিশ্বাস, যুক্ত প্রতিপলে,
আমৃত্যু সম্পর্ক সবটা নিয়ে
শুধু কিছু কম বেশি বলে।

অচ্ছেদ্য শুধু বাবা-মা বাকি সব শর্ত সাপেক্ষ গড়ে,
সময় মন হৃদয় আত্মা দেয় তেমনি করে।

বন্ধন

রক্তের টান, নাড়ির টান, প্রতিবেশী জাতভাই,
সম্পর্ক মানেই সততা আর নিঃস্বার্থপরতাই।

যে সম্পর্কে নেইকো দাবি শুধুই প্রাণের টান
পিতা-মাতা আর ভগবান!! সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ মান।■

যে প্রচলিত ভুলে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে।

প্রচলিত তিনটি ভুল

✗ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

✗ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

✗ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।

তারা খসার রাত

ডঃ মালা মুখার্জী

তিন্নি আজও জানলার ধারে বসেছিল, যদি একটা তারা খসা দেখা যায়। ছোটবেলায় আব্বু চিঠিতে লিখতো তারা খসা দেখে যা কিছু উইশ করা যায় তা নাকি সত্যি হয়। আজ তিন্নি বড়ো হয়েছে, সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার নীলোফার খাতুন, মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিতে মোটা মাইনেতে কাজ করা এক ঝকঝকে তরুণী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আজও ছোট্ট তিন্নি, যে একটা আশা নিয়ে প্রতিনিয়ত বাঁচে। আর কিছুদিন বাদেই হয়তো সেই আশাটা পূর্ণ হবে, নয়তো হারিয়ে যাবে চিরতরে। তাই আজ একটা তারা খসার ভীষণ দরকার।

নাঃ, আজ আকাশে কোনো তারা খসা নেই। তবুও তিন্নি আর একবার দূতাবাস থেকে আসা চিঠিটা পড়ে দেখল। একবার নয়, বারবার পড়লো, হ্যাঁ, নামটা তো ঠিকই লিখেছে, হাসান আলি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আব্বুর খোঁজ পাওয়া গেছে। যখন তিন্নি নিতান্তই দুধের শিশু তখন হতেই আব্বু নিখোঁজ। ওর জন্মের আগেই নাকি আব্বু জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে যান। তিন্নির তাঁকে মনেও পড়ে না। আব্বু কোনোদিনই আসেননি, শুধু আসত তাঁর চিঠি। একদিন

প্রতীক্ষা

নভেম্বরের মাঝামাঝি এমনই একটা চিঠি এসেছিল। তবে সেটা আব্বুর লেখা নয়, জাহাজ কোম্পানির চিঠি।

সোমালিয়ার উপকূল হতে একটা জাহাজকে জলদস্যুরা পণবন্দী করেছিল, তাতে ভারতের বেশ কয়েকজন নাগরিক ছিলেন, খালাসী, রাঁধুনী এমনকি একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। তিন্নির মনে আছে আম্মি ছোটাছুটি করেছিলেন এ দপ্তর, ও দপ্তর, নানা আর দাদাও সাথ দিতেন প্রথম প্রথম, তারপর চাচারা। কিন্তু জাহাজটা আর তার পণবন্দী নাবিকরা কখনো ফিরে আসেননি। সরকার মুক্তিপণ দিতে চাইলেও, কোনো অজানা কারণে জাহাজটি আর তার অপহরণকারীদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাদে, এক ব্যক্তি হাসান আলির নাম করে দুতাবাসে যোগাযোগ করেছেন, আব্বুর পাসপোর্ট আর ব্যাঙ্কের কাগজপত্র দেখিয়েছেন। তিন্নি আবার আকাশের দিকে চাইলো, হে আল্লাহ্, লোকটা যেন আব্বুই হয়।

আজ যদি আম্মু, বা নানা-নানি থাকতেন, নিদেনপক্ষে দাদিও থাকতেন, কত খুশী হতেন, দোয়া করতেন, কিন্তু এই পঁচিশ বছরে তিন্নির জীবন থেকে একে একে সবাইকে ওপরওয়ালা কেড়ে নিয়েছেন। আম্মুকে অনেকেই দ্বিতীয় সংসার করতে বলেছিলেন, কিন্তু আম্মু জীবনের শেষদিন অবধি আব্বুর জন্য অপেক্ষা করেছেন। একটা বুটিক খুলেছিলেন, এমব্রয়ডারির কাজ করে একা হাতে তিন্নিকে

বড় করে তুলেছেন অচেনা শহর মুম্বাইতে। প্রায়ই সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতেন, যদি আব্বুর জাহাজটা ফিরে আসে সেই আশা নিয়ে। আর, তারপর, প্রায় বিনা চিকিৎসায় ব্লাড ক্যানসারের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেকে শেষ করেছেন আম্মু। তার অনেক আগেই নানা-নানির ছায়া উঠে গিয়েছিল তিন্নির জীবন থেকে, আব্বুর আত্মীয়-পরিজনেরাও দুরে সরে এসেছেন। মায়ের স্মৃতিবিজড়িত মুম্বাই থেকে সরে এসেছে তিন্নি, চাকরি নিয়েছে দিল্লিতে। এখানে সমুদ্র নেই, নেই অভিশপ্ত স্মৃতিও।

আর্থিকভাবে তিন্নি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও আজও আব্বুর জন্য একটা কাজ বাকি রেখে দিয়েছে। আজ আর কোনো তারা খসবে না, তিন্নি জানলাটা বন্ধ করতে যাবে ঠিক তখনই আরশাদের হোয়টস অ্যাপটা এলো। কাল ওও যেতে চায় আব্বুর সাথে দেখা করতে। তিন্নি 'ইয়েস' লিখে ফোনটা সরিয়ে রেখে জানলাটা বন্ধ করলো।

আব্বুর অসমাপ্ত কাজের আর একটা হলো তিন্নির বিয়ে। আম্মুর মতো ওও মনের এককোণে আশা রাখে আব্বুর ফিরে আসার। আব্বুই না হয় ওর বিয়েটা দেবেন! জীবনের ছাব্বিশটি বসন্ত তিন্নি পার করেছে এই আশায়, অনেকেই ব্যঙ্গ করে, এমনকি আরশাদের আত্মীয়-পরিজনরাও ভাবতে শুরু করেছে মেয়েটির সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছে নেই। শুধু আরশাদই এত অবধিকাল বিনা প্রশ্নে তিন্নির

আশাটাকে সম্মান করেছে।

আরশাদ হয়তো আরও কয়েকটি কথা তিন্নির থেকে আশা করছিল, কিন্তু তিন্নি আবার জানলাটা খুললো, যদি একটাও তারা খসা দেখা যায় তো উইশ করবে লোকটি যেন আব্বুই হয়...

পুরো রাত কোনো তারা খসেনি। তবুও ভোর হতে না হতেই তিন্নির ফ্ল্যাটে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। দিনরাতের কাজের মাসি তিন্নির ইনস্ট্রাকশনে একটা ব্যলকনিওয়ালা ঘর আব্বুর জন্য রেডি করেছে। আব্বুর পছন্দের ডিশগুলো রান্না করেছে। আজ তিন্নি অফিসে যাবে না, ছুটি নিয়েছে, লোকটা যদি সত্যি আব্বু হয় তো অনেক পেপারওয়ার্ক করতে হবে।

ঠিক আটটা নাগাদ আরশাদ চলে এসেছে গাড়ি নিয়ে। হেমন্তের শিশিরের জলবিন্দু এখনো ওর গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনে লেগে আছে। ও স্ক্রিনটা পরিষ্কার করার সময়টাও নষ্ট করেনি। আজকের এই লোকটার ওপর ওর অনেকদিনের সম্পর্কের পরিণতি নির্ভর করছে। তিন্নি গাড়িতে উঠেই জানালো ও খুবই টেন্সড, কাল একটাও তারা খসা দেখতে পায়নি। আরশাদ হাসল, ওর তারা খসায় বিশ্বাস নেই, তবুও বলল, “হয়তো কুয়াশা ছিল।”

গাড়ী চলতে শুরু করলো। বসন্তকুঞ্জ, আর-কে পুরম ছাড়িয়ে চাণক্যপুরীতে গাড়ি ঢুকতেই তিন্নির বুকটা আশা-

নিরাশায় কেঁপে উঠলো।

তিন্নিদের গাড়ীটা দূতাবাসের কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই তিনতলার কাঁচের জানলা হতে একজোড়া ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ আরোহীদের দেখবার চেষ্টা করলো। যুবতী মেয়েটি নিশ্চয় তিন্নি, সঙ্গের যুবকটি তাঁর অচেনা মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখতে পেলেন না বৃদ্ধটি। আজকাল কোনো কিছুই তাঁর চোখে পড়ে না, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু মানসচক্ষে ভেসে ওঠে দুজন যুবকের মুখ, একজন হাসান আলি, অন্যজন রৌণক সরকার। একজন ছোট্ট মেয়ের বাবা, মালদার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বোম্বে এসেছিল কাজের খোঁজে, বিজ্ঞাপন দেখে খালাসীর কাজে দরখাস্ত ঠুকে দেয়। অন্যজন অভিজাত বাঙালী পরিবারের একমাত্র সন্তান, অ্যাম্বিশাস মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, দামী কোর্স করে মোটা মাইনের জব খুঁজছিল। দুজনেরই স্বপ্নপূরণ করেছে এস এস মেরিনা। রাজহংসীর মতো ধবধবে জাহাজে মুম্বাই হতে দুজনেই উঠেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়। অশক্ত হাতে বৃদ্ধ জানলার পর্দাটা টেনে দিলেন। তিন্নি আসুক, কাছ থেকেই না হয় দেখবেন।

“আপনার ভিজিটর্সরা এসে গেছেন, মিস্টার আলি,” দূতাবাসের কর্মীটি হাসিমুখে বললেন, “প্লিজ কাম হিয়ার।” পঁচিশ ছাব্বিশের মেয়েটির মুখের আদল মনে করিয়ে দেয় হাসানের যৌবনের মুখ। মেয়ে হওয়ার খবর

জাহাজেই পেয়েছিল হাসান। ওর স্ত্রী ফারজানা চিঠিতে লিখেছিল নাম ঠিক করে দিতে। হাসান পড়ালিখা জানা বন্ধুর শরণাপন্ন হয়েছিল। সাগরের নীল জলের সাথে মিলিয়ে রৌণক বলেছিল নীলোফার। আর ডাকনাম? একটাই নাম মাথায় এসেছিল, 'তিন্নি', নামটা রৌণকেরও বড় প্রিয় ছিল, একান্ত আপন।

হাসান জানত, তিন্নি নামটা রৌণকের মেয়ের। সে মেয়ে তখনও জন্মায়নি, কারণ প্রেমিকা তিতাসের সাথে রৌণকের প্রেমটি তখনও পরিণতি পায়নি। তিতাস আর রৌণকের কল্পনায় ছিল একটি হাসিখুশী প্রাণোচ্ছল শিশুকন্যা, যার নাম হবে তিন্নি।

চিঠিতে নামদুটো লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল হাসান। লোকটা বড় ভালোবাসত মেয়েকে। নিজের স্যালারির অংশ জুড়ে জুড়ে হাসান ওর মেয়ে নীলোফারের জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কে জমিয়ে ছিল অনেক টাকা, সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল মেয়ের ভবিষ্যত।

"তিন্নি," নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ছুটে এল বৃদ্ধের কাছে, "আব্বু..."

মেয়ের মাথায় হাত দিতে গিয়েও থেমে গেলেন বৃদ্ধ। "তুমি কখনও আমায় দেখতে আসনি কেন, আব্বু?" মেয়েটির মুখে অভিমানী প্রশ্ন শুনে পুনরায় বৃদ্ধের সামনে ভেসে উঠলো অতীতের অভিশপ্ত স্মৃতি।

প্রতীক্ষা

সব কিছু তছনছ হয়ে গেল সেই রাতে, যখন এস এস মেরিনা পেরোচ্ছিল গাল্ফ অব এডেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রৌণক আর হাসান কথা বলছিল। মাঝে মাঝে এক একটা তারা খসা দেখে রৌণক উইশ করছিলো, এই সাগরযাত্রার শেষেই যেন পরিণতি পায় তিতাস আর ওর সম্পর্ক। হাসানও দোয়া করছিল অজানা উল্কাদের কাছে তার দোস্তের জন্য। রৌণকের সঙ্গে থেকে থেকে তারা খসা দেখলে ওরই কেমন যেন উইশ করতে ইচ্ছে করে। হাসান তার শিশুকন্যা নীলোফারকে দেখতে চায়, স্ত্রী ফারজানাকেও, মেয়েটা বড্ড ভালোবাসে ওকে।

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে কোথা হতে জলদস্যুদের জাহাজটা ওদের জাহাজকে ঘিরে ধরলো। কালো মুখোশধারী লোকজন বন্দী করল ক্যাপ্টেনসহ সব ক্রুকেই। জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো অজানা দ্বীপের দিকে। এক চরম অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করলো এস এস মেরিনা।

দু'দিন কাটতে না কাটতেই হাসান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে রৌণককে জানালো এই অপহরণকারীরা সমস্ত ভিন্নধর্মী ক্রুদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের বাঁচানোর কোনো উপায় নেই, "কিন্তু বন্ধু তুমি বাঁচতে পারো, আমার নাম আর পাসপোর্ট নিয়ে।"

রৌণক চমকে উঠেছিল, "তোমার কি হবে, হাসান?"

"আমায় ওরা দেখলেই বুঝবে," হাসান বলেছিল, "আর

এক নামে দুজন খালাসী হতে পারেনা? আমি বলবো আমার পাসপোর্ট জলে পড়ে গেছে...”

“আর হিন্দু মেরিন ইঞ্জিনিয়ার? তার খোঁজ করবে না ওরা?”

রৌণকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই কালো মুখোশধারী জলদস্যুরা ওদের কেবিনে ঢুকে তল্লাশী শুরু করে। ভাগ্যক্রমে বা দুভার্গ্যক্রমে হাসানের পাসপোর্ট রৌণকের হাতে থাকায় রৌণক ছাড়া পেয়ে যায়। নাঃ, হাসানের কোনো কথাই জলদস্যুরা শোনেনি, কাজে লাগেনি কোনো ট্রিকস। ইমপোর্টেড মেশিনগানের গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল বছর ত্রিশের হাসানকে।

“আমি জানতাম আব্বু তুমিই ফিরে এসেছ। কাল সারা রাত তারা খসা দেখে উইশ করবো বলে বসেছিলাম, কিন্তু এত কুয়াশা ছিল যে....”

বৃদ্ধ রৌণক আবার চোখ বুঝলো, অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল ওর বলিরেখাময় গাল থেকে। হাসানের পরিচয় ওকে প্রাণে বাঁচালেও অত্যাচার থেকে বাঁচায়নি। অজানা দ্বীপে ক্রীতদাসের মতো খাটানো হয়েছে চব্বিশ বছর ধরে। যদি না কয়েকটি দেশের সরকারের যৌথ অভিযানে অত্যাচারীরা পরাজিত হত, তাহলে হয়তো দেশের মাটিতে কোনদিনও ফিরতে পারতো না রৌণক।

তিন্নিকে এবার পরিচয়টা দিতেই হয়, আর তার সঙ্গে

ওর বাবার খবরটাও, আর সেই বিদেশী ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টটার হদিশও।

কিন্তু তার আগেই তিন্নির সাথের যুবকটি বলে উঠল, "আব্বু, আপনি দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের চার-হাত এক না করলে আপনার মেয়ে হয়তো কোনোদিনই সোশাল ম্যারেজ করবে না। আপনি নিশ্চয় আমাদের এই আশাটি পূর্ণ করবেন?"

দুজন নিষ্পাপ প্রেমিক-প্রেমিকাকে আশীর্ব্বাদ করে বৃদ্ধ কেঁদে ফেললেন। তাঁর জীবনে তিন্নি কোনোদিন আসবে না, কারণ, খাতায় কলমে রৌণক সরকার মৃত পঁচিশ বছর আগেই। তিতাস আজ অন্যের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

"তোমাদের আশা পূর্ণ করবো আমি, অ্যাট লিষ্ট চিরতরে চলে যাওয়ার আগে..."

"কোথায় যাবে, আব্বু? তোমায় কোথাও আর যেতে দেবো না আমি..." তিন্নি বলে উঠলো।

"হ্যাঁ, মা, তাই-ই হবে নিজে দাঁড়িয়ে তোমাদের বিয়ে দেবো," না হয় তিন্নির বিয়ের পরই সত্যিটা উদ্ঘাটন করবে রৌণক। না হলে, চিকিৎসার অছিলায় সরে যাবে দূরে, অন্তত বন্ধুকন্যার আশাটি পূর্ণ করে তাকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেও হয়তো মৃত্যুর পর বন্ধুকে মুখ দেখাতে পারবে!

বৃদ্ধ রৌণক টেবিলের ওপর রাখা মেডিকেল রিপোর্টগুলোর

দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পঁচিশ বছরের অত্যাচারে যে মারণরোগ বাসা বেঁধেছে তাতে আর বেশীদিন নয়। তবে, প্রতিদিন রাতে রৌণক তারা খসাদের খুঁজত, উইশ করতো দেশে ফেরার, তিতাসের সাথে ঘর বাঁধার, তিন্নির মতো মেয়ে পাওয়ার। অজানা দ্বীপের রহস্যময় আকাশের খসে পড়া তারারা ওর আশা কিছুটা হলেও পূরণ করেছে...■

ডাকবাক্স ও হাতে লেখা চিঠি

নন্দিতা চৌধুরী

ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি
বসে এখান থেকে,
পিয়ন গেট খুলে বাড়িতে ঢুকছে, তা দেখেও
হচ্ছো না তুমি মোটেই উৎসুক!
ভাবছ কোনো অফিশিয়াল বুজরুক,
চিঠি লিখবে কে এখন?

কিন্তু পত্রবাহক পড়ে তোমার মন, বলে,
"এ চিঠি গো মা হলুদ খামে, পাঠিয়েছে নন্দন!"

ঝলসে উঠল মুখটি তোমার আনন্দ
উচ্ছ্বাসে,
খুলে খাম চিঠিটা তুমি পড়ে নিলে এক নিঃশ্বাসে!

হাতে লেখা চিঠির তো আর, নেই এখন চল,
আমার চিঠিতে তুমি
তাই হলে উতোরল!

মনে আছে আমাকে তুমি
করাতে পত্রপাঠ,
যাতে আমার উচ্চারণের
খুলে যায় গাঁট?

নস্টালজিক

লেখাতে আমাকে দিয়ে,
চিঠির শ্রুতলিপি,
অভ্যেস করাতে এ ভাবে
বানান, অনুলিপি?

লেখার ভুল শুদ্ধ, একালে তো, মেশিনে পড়ে ধরা,
তাই বানান ভাষার শিক্ষা অনেকের আজ, নেই আগাগোড়া!

একটি, সমগ্রতার বার্তাবাহী এ চিঠি
শব্দটি,
প্রেরকের হৃদয় মন উদ্ভাসিত এতে, যেন
ক্যামেরার ছবি!
ব্যাকুল হয়ে চিঠিকে জড়ায় গ্রহীতা বুকে
করে সুখে স্পর্শ...

পাঠ করে প্রাণ ঢেলে
চিঠিকে শুধু নয়, প্রেরককেও!

চিঠি হতে লব্ধ হয় যে
আনন্দ বেদনা,
অন্য কোনো মাধ্যমে নেই, তেমন সম্ভাবনা!

আজ পথের অনাবৃত ডাকবাক্স, আমাকে দেয় পীড়া ,
গর্বে যে দাঁড়িয়ে থাকতো
তারা, উঁচিয়ে
শিরদাঁড়া!

নস্টালজিক

কত প্রয়োজনীয় চিঠি, বিশ্বাসে, নির্দ্বিধায়,
ফেলে দিতাম অনায়াসে ডাকবাক্সটায়!

বিলোবার জন্য চিঠি নিতো এসে পিয়ন দিনেরটা দিনে,
উত্তরের অপেক্ষায় দিন কাটতো আমাদের
তারা গুনে গুনে!

প্রযুক্তি আজ কেড়ে নিয়েছে সম্পর্কের উষ্ণতা,
মোবাইলে সারে মানুষ আজ, জন্মমৃত্যুর কথা!

মুখোমুখি হওয়া গেছে আজ চুকে,
কাগজ আর কলম দুই-ই উঠেছে ডেকে।

কথা দিলাম আমি,
ছেড়ে প্রযুক্তির পথ,
রীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চে লিখে "ওঁ" নিলাম শপথ,
যথাযোগ্য করব সম্বোধন
চিঠিতে, শ্রীচরণেষু কিংবা বন্ধুবরেষু অথবা স্নেহের
ভাই বোন!

নীল কালিতে বিশেষ জনকে লিখে প্রিয়তম
বা প্রিয়তমা,
শূন্য পাতা ভরাবো আন্তরিক লেখনে,
হবে শুদ্ধ বানান,
দাঁড়ি, কমা!

নস্টালজিক

লিখনীতে হৃদয়ের নির্যাস
ঢেলে যথাস্থানে জানিয়ে
প্রণাম শুভেচ্ছা, টানবো ইতি,
হাতে লিখে চিঠি, পোস্ট করছি ডাকবাক্সে
আমি সম্প্রতি।

ঠিকানা খুঁজে পিয়ন এসে হাঁকবে...
চিঠি চিঠি,
নয় রেখে যাবে লেটার বক্সে দেখে এল.বি অক্ষর দুটি!

অপেক্ষার যে মধুরতা
মধুরতর করে নীরবতা,
অতীতের মতো মেঘদূত,
বলে যায় তোমার কথা।

আমি ছোট হ'ব আবার আসব তোমার কাছে,
চিঠির শ্রুতলিপি লিখব ভাববো সব তেমনই আছে
রাখছি আজ প্রণাম নিও
ভালো থেকো তুমি মেজদি,
পথ চেয়ে র'ব
ডাক হরকরার,
জবাব না পাওয়া অব্দি!

ইতি - নন্দন
তোমার প্রিয় বোন। ■

রাত্রি এলে

শুভা লাহিড়ী

রাত্রিটাতে কেমন যেন একলা হয়ে যাই
মনে হয় আশে পাশে কেউ বুঝি মোর নাই।
সারাদিন তো সাথে থাকে স্টেশন ভরা লোক
যদিও তারা আপন নয় পরের তবু হোক।
তবুও তারা দিনের বেলায় দেয় যে আমায় খাবার
ছোট্ট থেকেই খোঁজ পাইনি আমি যে গো বাবার।

জন্ম দিয়েই বাবা মোদের ছেড়ে গেছে চলে।
তখন আমি মাস খানেকের মা আমাকে বলে।
মা আমাকে বড়ো করেছে খুব-ই কষ্ট করে
হঠাৎ করে মা মরলো একটি দিনের জ্বরে।
তখন থেকে একাই আমি এই পৃথিবী জুড়ে
সারাদিনই বোতল কুড়াই রেললাইন ঘুরে।

রাত্রি এলে ঘুম আসে না মাকে মনে পড়ে
খোলা আকাশ হাতছানি দেয় বড্ড আদর ভরে।
সব তারাদের মধ্যে আমার মাকে দেখতে পাই
মা ছাড়া আমার যে কেউ গো কোথাও নাই।
প্রতিদিনই ভাবি আমি কবে যাবো সেথায়
দুঃখ কিছক থাকবে না গেলে বুঝি হোথায়।। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

আজাইরা প্যাচাল

অনিমেষ বৈশ্য

ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথা কতজনকে বলতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। কিংবা হয়তো বলেছি। কিন্তু যাকে বলেছি, কথাটা তার তেমন কিছুই মনে হয়নি। কার কী মনে হবে, বোঝা শক্ত। সবাইকে যে কাছা খুলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলতে হবে তারও কোনও মানে নেই। আরও কত কী তো বলা যায়। শব্দের পর শব্দ লিখে, শব্দের সিঁড়িভাঙা অঙ্ক পেরিয়ে, বেশ ঘুরিয়েপেঁচিয়ে বলাই তো যায়, 'বলছিলাম কী, একটা কথা ছিল...না, থাক পরে বলব।' গোধূলি গগনের নীচে এই 'পরে বলব'র মতো অমোঘ প্রেমের কথা আজ অব্দি কেউ বলেননি। কেউ শুনল কি না, জানা নেই। দু'একটা শুকনো পাতা হয়তো উড়ল। আমি ভাবলাম, যাক, তবু তো পাতা উড়ল।

যেমন একবার লিখেছিলাম (সম্ভবত চুরি করে) 'তোমার চোখের অরণ্যের গভীরতা আমার সব অসুখের এন্টিবায়োটিক।' যাকে লিখেছিলাম সে নির্ঘাত আমাকে বদহজমের রোগী ভেবেছিল। একটাও উত্তর দেয়নি। কড়া এন্টিবায়োটিক তার তনুমনে সয়নি। সইবেই বা কেন? সব কিছুর একটা সীমা আছে।

অথচ আমি জানি, কথাটা মিথ্যে ছিল না । শীতের ফুলকপির

কিছু কথা

গায়ে শিশিরের মতো কথাটা আমার উনপাঁজুরে হৃৎকমলে বহুকাল লেপ্টে ছিল। আমার খুব ঘন ঘন অসুখ করত। এখনও করে। অসুখ করলে আমার শুধু দু'টি নির্জন চোখ দেখতে ইচ্ছে করে। সেই চোখে কেউ ভেসে নেই। শুধু আমি আর দু'টি শুকনো পাতা। তাই লিখেছিলাম, 'তোমার চোখের অরণ্যের গভীরতা...।' কথাটা হয়তো আমার লেখা নয়। কিংবা হয়তো আমারই। বাক্যটা আমার সঙ্গে খুব যায়। মানে আমি খুব ভালো ভাবে ভাবতে পারলে হয়তো এমন একটি বাক্য লিখে ফেলা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মনে করতে পারছি না যে, ওটা আমারই বাক্য। কত কথাকেই নিজের কথা বলে মনে হয়। কিন্তু একটা কথাও আমি নিজে লিখিনি। সব অন্যের। একটা কালজয়ী লাইনও কি লিখতে পারব না? কে জানে! তেমন কোনও লক্ষণও দেখছি না।

আজ সকালে শুনছিলাম 'আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।' বোধহয় দু'কোটি বার শুনেছি। রবিবাবুর অন্য গানের তুলনায় এই গানটিকে একটু কাঁচা মনে হতো। ভাবতাম, তুমি তাই, তুমি তাই গো-র মধ্যে আর যাই হোক, আমার চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নেই। আজ হঠাৎ কে যেন আমর্ম নাড়িয়ে দিল। "আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস...।" 'তোমাতে করিব বাস' — ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। এমন একটা আশ্চর্য লাইন উনি লিখলেন কী করে! আমি আজীবন ভালোবাসব,

কিছু কথা

আমি আজীবন শুধু তোমারই...। না, এসব কিছুই উনি লিখলেন না। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল। ‘তোমাতে করিব বাস।’ বাস মানে কী? হয়তো তোমার সঙ্গে কানাগলিতে হারিয়ে যাওয়া, হয়তো জ্বরের কপালে জলপট্টি দেওয়া, হয়তো শুকনো পাতা উড়তে দেখে একসঙ্গে বিহ্বল হয়ে যাওয়া। একদিনের তো বাস নয়। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।

কিন্তু এটাও আমি লিখিনি। কত বছর আগে লিখে ফেলেছেন রবিবাবু। একটা মোক্ষম লাইন খুঁজছি। যা দীর্ঘ বরষ-মাস না হোক, অন্তত সকালে লিখে দুপুর অব্দি অমর হবে। ওই শীতের ফুলকপির গায়ে ভোরের শিশিরের মতো। কিন্তু লিখতে পারছি কই! থাক, পরে লিখব। ■

শুনুন শিল্পীর কণ্ঠে আরও কিছু সুন্দর গান

https://www.youtube.com/watch?v=mp0Ig1UCHbk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=0st25llB7rQ

https://www.youtube.com/watch?v=H_0i5hUbCj0
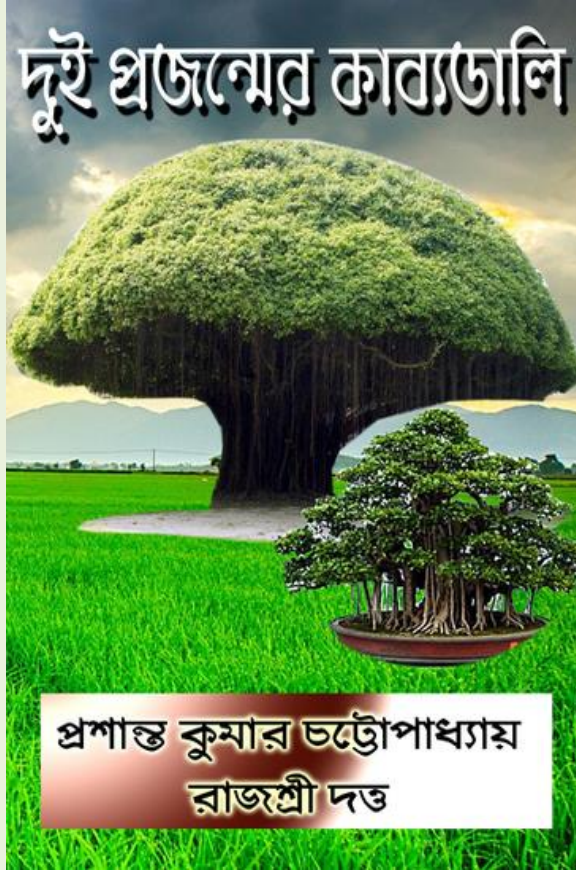
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

আমলকী পথ

ফাল্গুনী গিরি মণ্ডল

আমলকী চেরা পথে
সাজানো ছিল গ্রাম,
মায়ার আঁচল সেখানে
মুছিয়ে দিত ঘাম।

নদীর সাথে গল্প জমাতো
কোন এক সোনালী দুপুর,
নিখাদ হাসি ছড়িয়ে দিত
মন করে দিয়ে উপুড়।

আশা আছে ঘোমটা নিয়ে
রাঙামুখে আসবে সে দিন,
মিটিয়ে দেব হিসেব-নিকেশ
এ জনমের আছে যত ঋণ।

আশা আছে আদুরে হাওয়ায়
দুলবে ধানের শিস,
নিখোঁজ তালিকায় নাম লেখাবে
জমে থাকা মনের বিষ। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: মার্চ ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সুলতানা

মধুমিতা গণ

"ইনশাআল্লাহ মহব্বত তুম গলে লাগালো... " শাবানা বেগম নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলেন...।

প্রায় ৬০এর কাছাকাছি বয়স বেগমজানের এখনো তাঁর রূপে ঝলসে মরে তাঁর মজনুর দল। শহরের সবচাইতে আলিশান বাংলো 'গালিচা।' বেগম তাঁর একান্নবর্তী সংসার নিয়ে আল্লাহর মেহেরবাণী নিয়ে বুনে চলেছেন এক জীবন গাঁথা। প্রতিদিন মাহেফিল বসানোর আগে বেগমজান প্রায় আধ ঘন্টা আল্লাহর সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের গল্প করেন। আজকেও ব্যাতিক্রম নয়, আজ আবার তাঁর সবচেয়ে পছন্দের, সবচাইতে আদরের, হাজারো মে এক, জিগার কা টুকরা 'সুলতানা' র জীবনের প্রথম মেহফিল, বেগমজান নিজের হাতে আজ সুলতানাকে সাজাবেন। নিজের খানদানি হার-পায়েল-চুড়ি-টিকলি-মানতাসা-আংটি ইত্যাদি সাথে জমকালো সোনার সুতো দিয়ে কারুকার্য করা লেহেঙ্গা, সবশেষে চন্দনের সুগন্ধি আতর আর একটা লালগোলাপ খোঁপায়।

সুলতানা আজ ভীষণ খুশি আজ তার প্রথম মেহেফিল,

জ্ঞান হয়ে ইস্তক এই বাংলো তার খুব আপন, আসলে লোকমুখে জেনেছে বেগমজান তাকে ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়ে বুকে করে নিজের মেয়ের মতো লালন করেছেন। সুলতানা এখন ষোলো, অভিধান মেনে সুন্দরী- হাঁটু ছাপিয়ে চুল, গান-নাচ আর সেতারে অপরিসীম দক্ষতা।

আজ প্রথম সে তথাকথিত বাইরের সমাজের সামনে নিজের রূপ আর গুনের ডালি উন্মোচন করবে, মনে মনে সে ছেলেমানুষি স্বভাবে। বিচলিত বেগমজান নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন, তারপর নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, “হায়! তেরি আদা, তেরি নূর, না জানে আজ কিতনে ঘ্যায়েল হোগা...”

মেহেফিল শুরু হলো। চারিদিকে কেবল করতালি আর বাহবা...। গানের সুর আর সেতার ঝংকার তুললো, নাচের তাল ঝাড়বাতি কাঁপিয়ে দিলো আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁপলো অনেকগুলো হৃদয়। একেবারে শেষ সারিতে বসা এক মায়াবী দীঘি চোখের সাথে সুলতানার চোখের মিল হলো, আর সবার মতো লোভাতুর নয় সে চোখের ভাষা – এটুকু বুঝতে পারলো সুন্দরী...।

সে চোখের প্রতিটি পল্লব আর শিরা-উপশিরা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ, সুলতানা শিহরিত হলো। সুভাষ চ্যাটার্জী গ্রামের ছেলে, একেবারে অজগ্রাম যাকে বলে। বাবা গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিন ভাইয়ের মধ্যে

সুভাষ সব চাইতে ছোট, বাকি দুজন হাই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে পৈতৃক চাল আর পাটের ব্যাবসার কাজে হাত পাকিয়েছে, মেধাবী আর জেদি সুভাষ দু'চোখে ডাক্তার হবার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতার এক মেসে ভাড়া থাকে, এক নামী প্রতিষ্ঠানে প্রথম বর্ষের ছাত্র, গান তার খুব প্রিয়। কলকাতা এসে প্রথমে সে খানিকটা অথৈ জলে পড়েছিল, ক্রমে ধীরে ধীরে মানিয়ে গুছিয়ে গেলো সব। মেসে অমল নামক এক অমূল্য বন্ধুও জুটে গেলো।

আর নেহাত বয়সের মোহে, খানিকটা রোমান্টিক হবার ইচ্ছে নিয়ে, কিছুটা এই বিখ্যাত 'গালিচা'এর হাতছানি, দুই যুবককে অতিথি বানালো। মেহেফিলে সুভাষ হারিয়ে ফেললো নিজেকে... সুলতানা-সুলতানা-সুলতানা উফফফ কি জাদু যেন রূপকথা! সুলতানা ক্রমশ নিজের রূপ আর গুণের ছটায় এগিয়ে যেতে থাকলো। অসংখ্য ভক্ত, কিছু তাবেদার কিছু লোভাতুর চোখ, কিছু মুগ্ধ দৃষ্টি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার। কিন্তু সে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে চলে একজোড়া মায়াবী মুগ্ধ চোখ...।

প্রায়দিন নিরাশ হয়, ছেলেমানুষ মন। সুভাষ প্রতিজ্ঞা করলো যেভাবেই হোক সে সুলতানার সঙ্গে আলাপ করবে, নইলে যে...। অনেক চেষ্টা করে, বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে, অনেকটা অনুরোধ এর সীমানা পেরিয়ে, সুলতানার একান্ত আপন দাসী নাগমা রাজি হলো সুলতানার কাছে বিশেষ

চিরকুট পৌঁছে দিতে...।

“প্রিয় সুলতানা,

তুমি যখন এই চিঠি পড়বে আমি তখন তোমার কথা মনে করে হয়তো বিনিদ্র রজনী কাটাবো, আমার বোধহয় ডাক্তার হওয়া শিকেয় উঠলো। নিজেই যে মস্ত এক রোগ বাঁধাইয়া বসে আছি, এ রোগের চিকিৎসা জানা নেই আমার, যদি জানা থাকে, সেবা পরম ধর্ম এই বাণী বিচার করে জানিও।

ইতি

শেষ সারির একজোড়া মুগ্ধ চোখ...

সুলতানা কেঁপে উঠে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিলো, চিরকুট হাতির দাঁতের বাক্সে সযত্নে বন্দি হল। অপরজন সারারাত মেসবাড়ির জানলা ধরে আকাশের চাঁদ দেখতে দেখতে প্রথম প্রেমের মায়াজাল বুনলো...চারিদিক অশান্ত।

ইংরেজ পরাধীনতার কবল যেন আকাশ-বাতাস চিরে ফালাফালা করে দিচ্ছে। প্রতিটি যুবক হৃদয় তোলপাড়, পরাধীন ভারত মাতাকে বন্দি দশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য। প্রতিটি ভারতীয়র রক্ত ফুটছে যেন গরম লাভা। কান ফাটানো চিৎকার “বন্দেমাতরম।”

সেই চিৎকার সুলতানার বুকে আছাড় খেলো... “হে মাতৃভূমি তোমার পায়ের বেড়ি খুলে মুক্তি দেবে তোমার সন্তানরা, অপেক্ষা শুধু সময়ের।”

সুলতানা চিৎকার করলো "বন্দেমাতরম... "

মেসবাড়িতে ও সমবেত কণ্ঠে স্বাধীনতার আহ্বান "বন্দেমাতরম, জয় হিন্দ।"

সুভাষ গ্রামে চিঠি পাঠালো...তার না যেতে পারার কারণ হোল ভারতমাতার জন্য মুক্তি যুদ্ধ, সে কথা জানিয়ে। উত্তরে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ আশীর্বাদ এবং ছোটরা ভালোবাসা পাঠালো অফুরান।

ইতিমধ্যে 'গালিচা'তে এক বিশেষ বার্তা পৌঁছলো, স্বয়ং লর্ড সাহেব অতিথি হতে চান সুলতানার মেহফিলে। চারিদিকে যার রূপ আর গুনের এতো বাহবা, লর্ড সাহেব নিজের চোখে পরখ করতে চান সেই রূপসুধা। সুভাষের বিনিদ্র রজনী ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে আরম্ভ করলো, একদিকে সুলতানা অপরদিকে ভারতমাতা আর ডাক্তার হবার স্বপ্ন। চরম বিপদ পেরিয়ে, গা ঢাকা দিয়ে সে আবার এল 'গালিচা'তে।

সুলতানাও দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরে আবার তার প্রাণপুরুষের চোখের ভাষায় নিজেকে হারিয়ে ফেললো। মেহফিলে সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো, দুটি নবীন প্রাণের ভালোবাসার সাক্ষী হলো দামি ঝাড়বাতি। মেহফিল শেষ হলো। সুলতানা প্রায় চোরের মতো খুব খুব সাবধানে ছাদে পৌঁছলো। বেগমজান জানতে পারলে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা। কিন্তু অপরজন যে অপেক্ষারত...।

অন্য-গাঁথা

সুভাষ নিজের জামা ছিঁড়ে, হাত-পা জখম করে ভাঙা একখান পাইপ বেয়ে ছাদের এক্কেবারে ঈশান কোণে। আকাশের চাঁদ আর নির্মল বাতাস, জোনাকি আর শিউলি ফুলের গন্ধ। সুলতানার ওড়নার সালমা চুমকি আর সুভাষের কোমরে গোঁজা ভারতমাতার বীর সন্তানের উজ্জ্বল ছোড়া, সব সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক অপূর্ব কবিতা যেন... হঠাৎ "বন্দেমাতরম" আর রাইফেলের আর্তনাদ ছন্দপতন হলো কবিতার...।

সুভাষ প্রেয়সীকে বিদায় জানিয়ে কর্মযজ্ঞ হেতু এগিয়ে গেল আর সুলতানা চুপিসারে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পরে চিৎকার করে উঠলো "বন্দেমাতরম।"

লর্ড সাহেব এলেন নির্দিষ্ট দিনে মেহফিল সেজে উঠলো। সুলতানা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করলো। সুরের মূর্ছনায় জাদু ছড়ালো। লর্ড সাহেব সেই সুরের আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন...সুলতানা-সুলতানা-সুলতানা লর্ড সাহেবও নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। আজ প্রায় চারমাস সুভাষ গা ঢাকা দিয়ে আছে এক গোপন ঘাঁটিতে... প্রতিটি পদে পদে বিপদের আনাগোনা। ঘুমহীন চোখের পাতায় সুলতানা...এ জীবনে কি আর দেখা হবে? সুলতানার চোখ কাতর, ক্লান্ত – মেহফিলের তারিফ আর তার ভালো লাগে না। তার মনের গোপন কুটির হাহাকার করে...

"সুভাষ-সুভাষ-সুভাষ
ইনশাআল্লাহ,মোহাব্বত তু জালিম..."

হঠাৎ একদিন লর্ড সাহেবের আগমন... 'গালিচা' তাঁর চাই, এরকম আলিশান বাংলো তাঁর খুব প্রিয়। বেগমজান চিৎকার করে উঠলেন "কভি নেহি" তিলতিল করে তিনি গড়েছেন এই ইমারতের প্রতিটা ইজ্জত প্রতিটা ইমান। লর্ড সাহেব দু'দিন সময় দিলেন... শর্ত দিলেন হয় 'গালিচা' নয় 'সুলতানা' শুনে বেগমজান মূর্ছা গেলেন। ডাক্তার এলো, ওষুধ এলো বেগমজান শয্যা নিলেন, সুলতানা পা জড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদলো। লর্ড সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালো সুলতানা।

বেগমজান জানতে পেরে দু'টো কথা বললেন... "ইনশাআল্লাহ-ইনশাআল্লাহ।" গাড়ি এসে দাঁড়ালো নির্দিষ্ট দিনে, লর্ড সাহেব একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে এগিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট ঘরের দিকে। সুলতানা আরও একবার তার হাতির দাঁতের বাক্স থেকে চিঠি নিয়ে পড়লো... সুভাষ...

দরজায় টোকা... সুলতানা দরজা খুলে অথিতিকে ভিতরে আসার ইশারা করলো। 'সেলাম' লর্ড সাহেব নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন।

সুলতানা হাতে সেতার তুলে গান শুরু করলো... সেই গান গগন ভেদ করে ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বলোকে। লর্ড সাহেব চেয়ার থেকে নেমে সুলতানার ঠিক পাশে বসলেন।

সুলতানা নিজের চোয়াল শক্ত করলো... সাহেব একটা গোলাপ সুলতানার দিকে এগিয়ে দিলেন। সুলতানা তার কোমরবন্ধনী থেকে এক টুকরো বিদ্যুৎএর চুম্বন এঁকে দিল। সাহেবের বুকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়লো, চিৎকার কাঁপিয়ে দিলো প্রতিটা ইট। যে যেদিকে ছিল ছুটে এলো...

"সুলতানা-সুলতানা" দরজা ভাঙা হলো... সুলতানার দেহটার পাশে বিষের কৌটোটা যেন অট্টহাসি হাসছে। সুভাষ শেষ বারের মতো চিৎকার করলো "বন্দেমাতরম।" তারপর নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো, কিম সাহেবের রাইফেল চিরঘুমের দেশে পাঠালো আরও একটা তাজা প্রাণকে। ■

দফতর থেকে একটি জরুরি ঘোষণা

দেখতে দেখতে দেড় বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা ভাবতেই অবাক লাগে। এই নাতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে 'গুঞ্জন' সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক নামী এবং অনামা লেখকদের রচনায়। কোভিদ- ১৯ এর ভয়াবহ দিনগুলিতেও আমরা 'গুঞ্জন' চালিয়ে গেছি।

আজ একটা অনুরোধ সবার কাছে রাখতে চাই, এই আন্তর্জাতিক পত্রিকাটির সূত্রপাত 'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)' থেকে, তাই আমরা 'পাণ্ডুলিপি...'তে আপনাদের ব্যাপক যোগদান দেখতে চাই। এখন থেকে 'গুঞ্জন'এ লেখা মনোনীত করার সময় এই ব্যাপারটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ভাবাবেগ

সোমনাথ চৌধুরী

ভাবাবেগ কি বস্তু?
তা রয়েছে মোর জ্ঞানের অগোচরে
আমি বুঝি না যে
এটা কি অতিশয় আবেগের দুরন্ত আতিশয্য?
নাকি ক্ষোভ অথবা প্রত্যাখ্যাত
প্রেমের যন্ত্রনার বহিঃপ্রকাশ?

ভাবাবেগ কথার প্রকৃত অর্থ কি?
বাণিজ্যিক ব্রীড়াহীন জগতে
এর মূল্য কে দেবে?
স্বার্থপর প্রেমহীন দুনিয়ায়
মানবতাহীন সমাজে ভাবাবেগ
আজ পদস্পৃষ্ট।

ভাবাবেগের কি আজ কোন মূল্য আছে!
আজ এই আধুনিক টানা পোড়েনের সমাজ প্রেক্ষাপটে?
যেখানে অবহেলিত, ক্লান্ত,বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পাঠানো হয়
বৃদ্ধাশ্রমে?
জীবনের বাদবাকি দিনগুলো, পরিবার বর্জিত, স্নেহ মায়া
বঞ্চিত হয়ে কাটান তাঁরা

প্রশ্ন

বৃদ্ধাশ্রমের দেয়ালের অন্তরালে।

অর্থের জোয়ারে ভেসে যাওয়া
মানুষের কাছে
কি কোন মূল্য আছে ভাবাবেগের?
আজকের সমাজ প্রেমহীন, নগ্নত্বভরা মানসিকতা
কুড়ে কুড়ে গ্রাস
করছে মানুষের হৃদয়।

এই সমাজে ভাবাবেগ
যেন কালিমা ঢাকা আকাশে
চন্দ্রের রাহুগ্রাস।। ■

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি জানা অজানা কথা

বিজয় নারায়ণ চৌধুরী

"বন্দেমাতরম" দেশমাতৃকার চরণ বন্দনা করে ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নারী-পুরুষ যাদের আত্মত্যাগ ও বলিদানে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে এই লেখা শুরু করছি।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যাঁরা লোকসভায় নির্বাচিত হন তাঁরা ভারত সরকারের চালিকাশক্তি। যে দলেরই হোন না কেন নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা কোন দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন। তাঁরা দেশ-জনতার প্রতিনিধি। এই কারণেই সংবিধানে উল্লিখিত দেশের "নিরপেক্ষতা ও অখণ্ডতার" শপথ নিতে হয় প্রত্যেক সাংসদকে। নির্বাচিত হয়ে শপথ নেওয়ার পর তাঁরা "বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ" বলে শেষ করেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের কণ্ঠে জাতীয় স্লোগান ছিল 'বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ'। এই দুটি স্লোগান বাঙ্গালিরই সৃষ্টি ও বাঙালি বিপ্লবীদের মাধ্যমেই

সারা ভারতে এই ধ্বনি মুক্তিসংগ্রামের শ্লোগান হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ‘বন্দেমাতরম’ গানটি নিজে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন। তারপরই তা জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক ধ্বনি হিসাবে সর্বজন পরিচিতি পায়।

১৯০৫ সালের ১৬ই আগস্ট বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য ইংরেজ সরকার বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। এর প্রধান হোতা ছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। বড়লাট তাঁর এক গোপন চিঠিতে লিখেছিলেন “বাংলার শক্তি তার একতায়, তাকে দু’ভাগ করলে তার শক্তিকে ভাঙা যাবে।” বাংলা কিন্তু মেনে নেয়নি বঙ্গভঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে সারা বাংলা গর্জে উঠল “বন্দেমাতারাম, আমরা ইংরেজদের দম্ভ চূর্ণ করবোই। কিছুতেই বঙ্গভঙ্গ মেনে নেব না।”

সারা বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইলো। ১৯০৫ সালের ১৬ই আগস্ট লক্ষ লক্ষ মানুষ খালি পায়ে মিছিল করেছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান “বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হউক এক হউক হে ভগবান।”

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মধ্যে শুরু হলো রাখীবন্ধন, রবীন্দ্রনাথ নিজে কলকাতার বিখ্যাত

নাখোদা মসজিদের ইমামের হাতে রাখি পরিয়ে ছিলেন। ইমাম আনন্দে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এর সঙ্গেই শুরু হলো বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের জন্য আন্দোলন। সেইসময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গড়ে তুললেন বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা। তখন নানা দিকে নানা ছোট ছোট কারখানা তৈরি হতে লাগলো স্বদেশী দ্রব্যের জন্য। এদের সাহায্য করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগ নিলেন স্বদেশী ভান্ডার প্রতিষ্ঠায়। খুব কম লোকই জানেন সেই সময় স্বদেশী চাঁদার সাহায্যেই ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলেন জামসেদজী টাটা। স্বদেশী আন্দোলনের দাপটে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল। তখনই এই "বন্দেমাতরম" ধ্বনি সবার মুখে মুখে ফিরতো।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশন। সেই অধিবেশনে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। সেই পতাকা ছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। তার মাঝখানে হিন্দি ভাষায় বড় করে লেখা ছিল "বন্দেমাতরম।" আর সেই পতাকা উত্তোলন করেছিলেন বাংলার সর্বভারতীয় নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর নামে কলকাতায় W. C. Banerjee Road আছে।

আমরা অনেকেই জানিনা পার্সি মহিলা বিপ্লবী ভিকাজি রুস্তম কামা সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ

করেছিলেন ১৯০৭ সালে ষ্টুটগার্ড আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। বক্তৃতার সময় তাঁর হাতে ছিল বন্দেমাতরম লেখা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। বিশ্বের দরবারে তিনিই প্রথমা যিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করেন। তখন কংগ্রেস বা অন্য কোন দল এটা ভাবতেই পারেনি। এই মহান বিপ্লবী মহিলার নামে দিল্লিতে একটা বড় পার্ক আছে।

বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয় মাত্র ১৯ বছর বয়সে। ক্ষুদিরামকে স্মরণ করেই বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি” গানটি। বাংলায় আমরা ক'জন তার কথা স্মরণ করি জানিনা। ফাঁসির মঞ্চে তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল “বন্দেমাতরম” বিহারের মুজাঃফরপুর আজও তাঁকে ভোলেনি। ১১ই আগস্ট জেলখানায় ভোর বেলায় যেখানে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেখানে শত শত মানুষ সমবেত হয়ে প্রদীপ জ্বালান ও মালা দেন। তারপর তাঁরা একটা পার্কে যান যার নাম ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী স্মারকস্থল, সেখানে তাঁরা জড় হয়ে নীরবতা পালন করে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানান। আজও মুজাঃফরপুর এর মানুষ তাঁদের জন্য গর্ববোধ করেন।

আমরা খুব কম লোকই জানি যে নেতাজি সুভাষ ভারতীয় জাতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার জেলে গেছেন। দুইবার অন্তরীণ ছিলেন। কলকাতার মেয়র

থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কলকাতার রাস্তায়। সেই সময় ব্রিটিশ সরকারের ঘোড়সওয়ার পুলিশ মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য এলোপাথাড়ি বেটন চালায়। তাতে সুভাষচন্দ্রের কব্জি ভেঙে যায়। তারপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জেলেও তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়। কলকাতার কোন মেয়রের এই ইতিহাস আছে কিনা জানা নেই।

আমরা সবাই জানি ১৯৪১ সালে সুভাষ ব্রিটিশ সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় নাটকীয়ভাবে পলায়ন করে প্রথমে পৌছলেন কাবুলে। সেখান থেকে জার্মানিতে, পরে জাপানে, ১৯৪৩ সালে গড়ে তুললেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মের একতার প্রতীক "আজাদ হিন্দ ফৌজ" তিনি সর্বাধিনায়ক হয়ে ভারতের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শুরু করলেন মৃত্যুভয়হীন মুক্তি সংগ্রাম। ভারতের কোহিমাতে উড়িয়েছিলেন স্বাধীনতার পতাকা। আন্দামান-নিকোবরও তাঁর সরকারের অধীনে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত যদিও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই সংগ্রাম সমগ্র দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হারিয়ে গেলেও দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার মহান নেতা হিসাবে চিরকাল আলোর দিশা হয়ে বেঁচে থাকবেন। তাঁর সৃষ্টি "জয় হিন্দ" জাতীয় স্লোগান হিসাবে দিকে দিকে

উচ্চারিত হয়। এখনও এই "জয়হিন্দ" স্লোগান ভারতবাসীকে আবেগ তাড়িত করে তোলে।

আমাদের অনেকের কাছেই অজানা ১৯৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল চতুর্থ মাদ্রাজ কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটেলিয়নের ১২ জন সৈনিককে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য গ্রেফতার করা হয়। এনারা সবাই ছিলেন বাঙালি। সামরিক আদালতে এঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে নয়জনের ফাঁসি হয় ১৯৪৩ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর। তিনজনকে পরে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একদিনে ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা আর নেই। ফাসুরে ছিল শিবু ডোম। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় এঁরা সবাই ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন "বন্দেমাতরম" স্লোগান দিতে দিতে।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে যাঁদের সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি তাঁদের কথা ভারতের মানুষ ভুলে গেছে। পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো মনেও করবে না কোনদিন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তখনকার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের তিনজন নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সারা ভারতের মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জয় হিন্দ

গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁরা হলেন সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত — খান আবদুল গফফর খান, তাঁর বড় ভাই সীমান্ত কেশরী ডাঃ খান সাহেব এবং বালুচিস্তানের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুল সামাদ খান। যিনি বালুচ গান্ধী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই তিনজন অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে বালুচিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ" ১৯৪৬ সালে নেহরুর রাজনৈতিক সফরকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ কারোর প্ররোচনায় ও উৎকোচে একশ্রেণীর আফ্রিদি নেহরুকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করে ও গুলি বৃষ্টি শুরু করে। সীমান্ত কেশরী ডাঃ খান সাহেব তাঁকে তখন বুকে জড়িয়ে ধরে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আফ্রিদিরা ডাঃ খান সাহেবকে দেখে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তীকালে ভারত সরকার তাদেরকে মনে রাখেনি। শেষ জীবনে তাঁদের কি হয়েছিল! আমরা খুব কম লোকই জানি। খন্ডিত ভারত মেনে না নেওয়ার অপরাধে এঁরা তিনজনই পাক সরকারের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আবদুল গফফর খান জেল থেকে অত্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় মুক্তি পেয়ে কাবুলে চলে যান। দেশে আর ফিরতে পারেননি। কাবুলেই

তাঁর মৃত্যু হয়। ডাঃ খান সাহেবকে মুক্তি দিয়ে দিনের বেলায় পাক সরকার রাওয়ালপিন্ডির রাস্তায় গুলি করে হত্যা করে। আর বালুচ গান্ধী আব্দুল সামাদ খান পাক সরকারের কারাগারের অন্ধকারে চিরদিনের মত হারিয়ে যান। তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এঁদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

এই ত্যাগ ও আত্মবলিদানের পরেও আমাদের অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। ইংরেজ সরকারের চক্রান্তে এবং মৌলবাদী শক্তির প্ররোচনায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট শুরু হলো দাঙ্গা। সারা ভারতবর্ষের মাটি নিজেদের হানাহানিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। সহস্র সহস্র মানুষ মারা গেলো, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হলো, রাজনৈতিক নেতারা মেনে নিলেন খন্ডিত ভারতের স্বাধীনতা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে হাজার হাজার শহীদের রক্তে রাঙ্গা মাটিতে জন্ম নিল খন্ডিত ভারতের স্বাধীনতার কিশলয়। ১৯৪৮ সালের ২৬ শে জানুয়ারি তৈরি হলো প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। এরপরেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন সফল হল কি? ভারতের অগণিত বীরের রক্তস্রোতে যে স্বাধীনতা এলো, সেই ভারতের সংস্কৃতি ও স্বদেশীকতার মূল্যবোধ আজ ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমের অপসংস্কৃতি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই

সুযোগে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করার জন্য বিদেশি শক্তি ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আমি আশারাখি মহান বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে চিন্তাশীল ভারতবাসী। কবিগুরুর ভাষায় আমাদের মত সব সাধারণ মানুষকে ভাবতে হবে —

“বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?”

(জয় হিন্দ) ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) ‘গুঞ্জন’ এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা ‘গুঞ্জন’ এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান
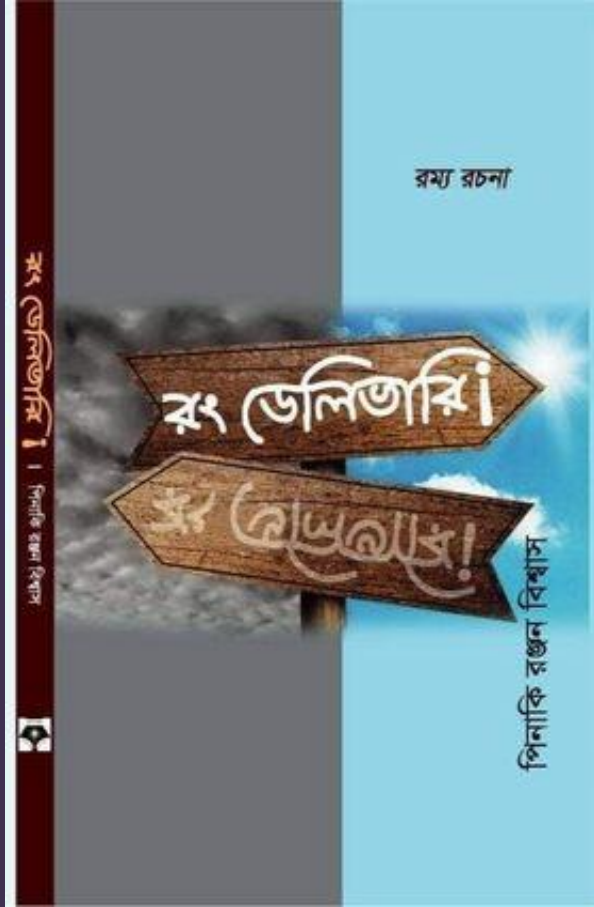
বর্ষবরণ

২০২১

সমীর দাস

জোড়া বিষ দুহাজার বিশ চলে গেল
অমৃত এল না
কত আশিস মহাপুরুষ ঢলে গেল
বিষ গেল না।

বয়স একুশ হল নাবালকতা ফিরে গেল
এবছর সাবালক হোক
মানুষ হতাশ ছিল কত ঝড় এসে ছিল
এইবার আলোক আসুক।

ঘোর কলির শেষ হোক এই সালে
বিভোর ফুলের চাষ হোক এই কালে। ■

নতুন বছর শুরু হোক আনন্দ – উচ্ছ্বাসে,
সুস্থ থাকুন, স্বচ্ছ থাকুন, থাকুন আনন্দেতে...
'পাণ্ডুলিপি'র পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই
ইংরাজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন...

বন্ধুত্ব

সিদ্ধার্থ বসু

স্মৃতির পাতার বিবর্ণ রং,
মর্মর ধ্বণি বিজড়িত,
মনের ঘুর্নি জুড়ে এলোমেলো
বর্ণময় কোলাজ এঁকে চলে নিরন্তর।
সপ্তসুরে গাঁথে লুকোচুরির গান।
ভালোবাসার পদধ্বনি আজো শোনা যায় অন্তরে...
চুপিসাড়ে এলো বসন্তে ডালি সাজিয়ে,
খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিল মন খারাপের হিসেব
বৈরাগী হাওয়ায় ভেসে...
জীবনের মরণের বন্ধুর আঙ্গুলের ডগা বেয়ে,
কর স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে,
বেমালুম সব ভুলে থাকা যায়,
রিক্ততার ইতিহাসের অলি-গলি,
নব উচ্ছ্বাসে সৃষ্টির সুরে আপাত বাহ্যরূপের বাহারে,
আমরণ অঙ্গিকারে আছি থাকবো জীবনে মরণে
যে কোনো দহনে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ আঁধারের গহীনে আলোর প্রজ্জ্বলন...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ মিশ্র ভারত...

চিত্র গ্রহণেঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

প্রিয় পাঠক মহোদয় / মহোদয়া,

'গুঞ্জন'এর পাতায় আপনার তোলা আলোকচিত্রটি দেখতে হলে আজই সেটা আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। ছবির নাম এবং চিত্রগ্রাহকের নাম লিখতে ভুলবেন না। আলোকচিত্রের রিসল্যুশন ৩০০ ডিপিআই হওয়া আবশ্যক।

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ অনুকরণ...

চিত্র গ্রহণেঃ রাজশ্রী দত্ত

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আগমনী

প্রণব কুমার বসু

গত জুলাই মাসে অর্ঘ্যর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুমনার। আলাপ ছিল অনেকদিনের, তবে সেটা যে এভাবে বিবাহের মোড় নেবে তা ওরা কল্পনাও করেনি কোনদিন। দাদার বন্ধু অর্ঘ্যর বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল। কিন্তু তাতে কী? দাদার কত বন্ধুইতো এ বাড়িতে আসে, তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় আছে সুমনার।

গন্ডগোলটা বাঁধিয়েছিল তপনদা — চিঠিটা পড়েছিল একেবারে মায়ের হাতে। ব্যাস আর যায় কোথায়! সোজা খবর পৌঁছে গেল বাবার কাছে। তপনদার কাকা আবার বাবার অফিসে অধস্তন কর্মচারী। বাবা মায়ের একদমই পছন্দ নয় তপনদার পরিবারের লোকজনদের। দাদার বিয়ের সময় সব বন্ধুরাই এসেছিল শুধু তপনদা ছাড়া, সুমনা একটু অবাকই হয়েছিল।

দাদার বিয়ে খুব জাঁকজমক করেই হয়েছিল। বৌদিকে মা পছন্দ করেছিল একটা বিয়েবাড়িতে। বিয়ের পর ছ'মাস কাটতে না কাটতেই একদিন বাবা অর্ঘ্যর সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে শুরু করেছিল। কিছুটা অবাক

হয়েছিল সুমনা যখন বাবা অর্ঘ্যকে বিয়ে করতে বলে — "এটা কীভাবে সম্ভব! আর তাছাড়া সামনে বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা!"

সবাই সুমনাকে বোঝাল বিয়ের পরেও পরীক্ষা দেওয়া যায়। অর্ঘ্যর সঙ্গে বিয়েটা হয়েই গেল। কিছুটা যেন ঘোরের মধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে হানিমুনে গিয়ে অর্ঘ্যকে বেশ ভালোভাবে চিনতে পেরেছে সুমনা। না বাবা-মা ঠিক যোগ্য ছেলেকেই বেছে নিয়েছে তার জন্য।

এখন সুমনার সারাদিনের ধ্যানজ্ঞান শুধু অর্ঘ্যর সার্বিক উন্নতি। দোতলার টু রুম ফ্ল্যাট — সামনে একটা ছোট বারান্দা। নিউ নরমাল সিচুয়েশনে অর্ঘ্য এখন সপ্তাহে তিনদিন অফিস যায়। আর বাকি দিনগুলো বাড়িতে বসেই কাজ করতে হয়। সেটাই বেশী ঝামেলার ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারেনা।

বাবা-মা আর দাদা-বৌদি একটা রবিবার খবর না দিয়ে চলে এলো। সারাদিন গল্পগুজব আড্ডা মেরে কেটে গেল। রাত্তিরে ফোন করে খাবার আনিয়ে খাওয়া হলো সকলে মিলে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে মাকে না বলে থাকতে পারেনি সুমনা।

"মা, তুমি খুব তাড়াতাড়ি দিদা হবে" নতুন সদস্যের আগমন বার্তা শুনে মা জড়িয়ে ধরল সুমনাকে। অর্ঘ্যের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ■

গুঞ্জন পড়ুন ৯ গুঞ্জন পড়ান

PREVENTION OF COVID - 19
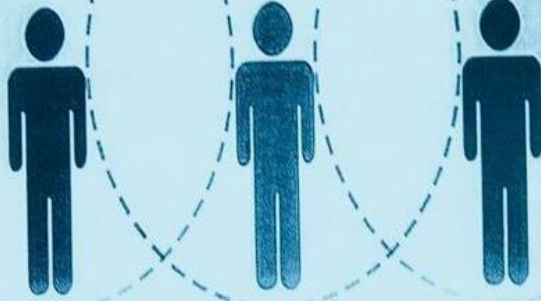
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels